

# পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

e-পত্ৰিকা

# eष्ट्रियण

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা আগস্ট, ২০২০

মুখ্য সম্পাদক: ড. সুকুমার চন্দ্র, অধ্যক্ষ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সম্পাদক: শ্রীমতি অদিতীয়া চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকমন্তলী: ড. জয়দেব বেরা , সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ড. সর্বশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ড. অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

শ্রীমতি সুজাতা মাইতি, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

<u>ড. পীযৃষ কান্তি ভট্টাচার্য, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়</u>

প্রচ্ছদ অঙ্কন: শম্পা সিং, চতুর্থ সেমেস্টার (স্নাতক, সাম্মানিক), প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

অলংকরণ: সায়ন্তন দিন্দা, চতুর্থ সেমেস্টার (স্নাতক, সাম্মানিক), প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

প্রকাশনা: পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়, মালিগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪০

### মুখ্য সম্পাদকের কলম

দেখতে দেখতে কলেজের বয়স আজ ৫৬ বছর। ১৯৬৫ সালের ১৯শে আগস্ট জন্মান্টমীর দিন জন্ম নিয়েছিল আজকের পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়। নেপথ্যে ভূমিকা ছিল স্বপ্ন দেখা সেই মানুমগুলোর যার মধ্যে অন্যতম শ্রী গনেশ চন্দ্র মাইতি, শ্রী হরিপদ জানা, ডাজার নিমাই চাঁদ ঘোষ ও ডাজার শশীকান্ত সামন্ত প্রমূখ। পার্শ্ববর্তী গ্রাম রাজবল্পভের জামাতা শ্রী নন্দকিশোর ঘোষের সাহায্যানুকূল্যে সম্ভব হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন। কলেজের জমি দান করতে এগিয়ে আসেন শ্রী সুধীর চন্দ্র মাঝি ও শ্রী গুণধর মাঝি। অধ্যক্ষ অরুণ কুমার চৌধুরী সেই চারাগাছটিকে পরিণত করেন মহীরুহে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী মিলে ১০০ জনেরও অধিক আমাদের পরিবার। এই বৃহৎ কর্মশালার হাজারো সমস্যার মধ্যে আমার প্রিয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা কখনোই পিছপা হন না কলেজের কল্যাণ কেন্দ্রিক কাজ থেকে।কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর সৌমেন কুমার মহাপাত্র মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েও পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসাবে এই বিশাল দায়িত্বভার নিতে পিছপা হননি। সব সময় আমাদের দাদার মতো তাঁকে কাছে পাই আমরা।

কলেজ তথা রাজ্য তথা দেশের ইতিহাসে আজ আমরা এক অদ্ভুত পরীক্ষার সম্মুখীন। কারণ- করোনা নামের ভাইরাস। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে নতুন প্রস্তুতির মাঝে দাঁড় করিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ৩০-৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে শ্রেণিকক্ষেসামলাতে নিপুন ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। নিজেদেরকে তৈরিও করতেন তারা সেই ভাবে। কিন্তু না, পিছনের চিরাচরিত প্রথা ফেলে তৈরি হতে হবে এক নতুন অনলাইন নিয়মের সাথে। অনলাইন ক্লাসের ছেলের পাশে অভিভাবক। কাজেই অভিযোগ-অনুযোগ অনেক অভিভাবকদেরই। উনি এত খারাপ পড়ান, উনার এই রকম উচ্চারণ ইত্যাদি ইত্যাদি।সমস্ত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তাই আমার বার্তা সবাইকে সময় দিতে হবে নতুন এই নিয়মের সাথে নিজেদের যথোপযোগী করার জন্য। আমাদের এই গ্রামীণ এলাকায় একটি ছাত্র কিন্তু দিল্লি বা কলকাতা শহরের মত বড় বড় আধিকারিকদের দেখে বড় হয় না। আমাদের জন্য আমাদের প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকই আমাদের আদর্শ। আমাদের শ্রন্ধেয় শিক্ষক আমাদের কাছে নমস্য। তাই চাইব, একটি ছাত্র যেন শিক্ষককে অশ্রন্ধা করার মাঝে নতুন কিছু করার আনন্দ না পায়। আসুন আমরা সবাই মিলে সমাজকে গড়ে তুলি, সবাই মিলে নিজেদেরকে নতুন ব্যবস্থার জন্য তৈরি করি, নতুন পৃথিবীকে স্বাগত জানাই।

নতুন চেষ্টার মাঝে প্রথাগত ম্যাগাজিনের বাইরে তাই আজ আমরা প্রকাশিত করতে চলেছি e-ম্যাগাজিন । নাম রাখা হলো eচ্ছেমত । সবাইকে পড়ার আমন্ত্রণ রইল।

> **७. সুকুমার চন্দ্র** অধ্যক্ষ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

### সম্পাদকের কলম

একদিন ঠিক সেরে যাবে মহামারী। হেরে যাবে ভাইরাস। জিতে যাবে বিজ্ঞান। জিতবে ধৈর্য্য, শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়। একদিন ঠিক হেরে যাবে ভয়- হেরে যাওয়ার ভয়, হারিয়ে ফেলার ভয়। স্কুল-কলেজের বেঞ্চে ধূলো জমবে না আর। রাস্তায় বেরোলে জবাবদিহি করতে হবে না পুলিশের কাছে। লোকাল ট্রেনের ধাক্কাধাক্কি ভিড় থাকবে। অ্যাটেন্ড্যাঙ্গ খাতায় লাল কালির চিন্তা থাকবে। সৌরভকে দেখতে উপচে পড়বে ইডেনের গ্যালারি। ইস্টবেঙ্গল জিতলে লাল-হলুদ আবিরে ভাসবে যুব ভারতী। বাড়ি থেকে অতিথি বিদায় নিলে স্যানিটাইজ করতে হবে না ঘর। বরং বলা যাবে, "আবার এসো।"

একদিন ঠিক সেরে যাবে মহামারী। অবিশ্বাসের মহামারী। বিশ্বাসভঙ্গের
মহামারী। স্ব-অর্থ অন্তাচলে গেলে উদয় হবে শুভবুদ্ধির। মানুষ বুঝবে, অপরের ভাবনার
অনুকরণে দ্রুত কার্যসিদ্ধি হলেও জয়ী হওয়া যায় না, কারণ তা অনুকরণই, সৃজন নয়।
কীর্তির শিখর ছোঁয়ার ইঁদুর দৌড় থাকবে না আর। থাকবে না অপরকে ছোটো করে বড়ো
হওয়ার প্রচেষ্টা। 'কৃতজ্ঞতাবোধ', 'সহানুভূতি' শব্দগুলো বেঁচে উঠবে অভিধানের বাইরেও।
মানুষকে পাশে পাবে মানুষ- দুঃখে কিংবা আনন্দে, বিপদে কিংবা সাফল্যে। 'আছি' থেকে
'নেই'-এ বিলীন হওয়ার পথে ঠিক দাগ কেটে যাব আমরা। জেগে উঠবে চেতনা- মাস্কবিহীন।

একদিন ঠিক সেরে যাবে মহামারী। অসামঞ্জস্যের মহামারী। মনুষ্যত্বহীনতার মহামারী। ভেদাভেদ থাকবে না মানুষে-মানুষে, স্ত্রী-পুরুষে - সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক। থাকবে না হিংসা, অবজ্ঞা, ঘৃণা, ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা। মানুষের ধর্ম হবে কেবল মনুষ্যত্ব। কয়েক ফোঁটা স্যানিটাইজারের প্রলেপে কি বিশুদ্ধ হবে না বিবেক?

একদিন ঠিক সেরে যাবে মহামারী। চৌর্যবৃত্তির মহামারী। তালা থাকবে না বাড়ির দরজায়। পাসওয়ার্ড থাকবে না ফোনে। ব্যক্তিগত তথ্য 'হ্যাক' করে ফায়দা লুটবে না কেউ। জীবনের 'ইন্সিওরেন্স' রাখার প্রয়োজন পড়বে না আর। বিলুপ্ত হবে 'প্ল্যাগিয়ারিজম' শব্দটা। নির্মাণের পাহাড় গড়া কৃতিত্ব নয়, খ্যাতির লোভ নয়, সৃষ্টির উল্লাস থাকবে। কোনো সফ্টওয়্যারের সাধ্য কোথায় সৃষ্টির মানদন্ড বিচার করার!

একদিন ঠিক সেরে যাবে মহামারী। জিতে যাব আমরা। এই সমস্তটাই ইচ্ছে। তবু ইচ্ছে দিয়েই তো শুরু। ইচ্ছেদের ভাগ্যিস লকডাউন থাকে না!

শ্রীমতি অদ্বিতীয়া চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

## বিশেষ কলম

## অনিশ্চিত

অধ্যাপক প্রবীর ঘোষ রায়

জয়েন্ট ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্স্ট্রাকশঙ্গ ডিপার্টমেন্ট অব হায়ার এডুকেশন গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

অনিশ্চিত জন্যেই সুন্দর
চলে যাবো বলেই আসা
তাই ভালোবাসা
অসম যুদ্ধের শেষে
জেগে থাকা শেষ তৃণ-বাণ।

একটু বৃষ্টি হবে বলে
মৃতপ্রায় যে নগরী
সহস্র বৎসর বসে আছে প্রার্থনায়
আজ এক প্রেমিকের বর্শাফলক
মেঘের বুক ছিঁড়ে
তার জন্য প্রলয় এনেছে।

শেষ পর্যন্ত ভালোবাসারই জয়,
অক্ষেহিণী সেনার বীভৎস আড়ম্বর
কেবল বাতাসে ভেসে আসা
খড়কুটোর মতো লক্ষ্যভ্রস্ট হয় সকলে তা জানে,
তবুও শাসক অস্ত্রের দীর্ঘ অভ্যাসে চায়
কবি আজও ভয় পাক তাকে।

### विश्य कलम

# মুছে দিতে হবে নতুন সৃষ্ট দ্বীপ

ড. কৌশিক ঘোষ

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খড়গপুর কলেজ সদস্য, পরিচালন সমিতি, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী দুরদর্শনের পর্দায় এসে উত্তরীয় দিয়ে মুখ ঢেকে জনগণের 'সাথ <mark>চাইলেন সাত বিষয়ে'। পৃথিবীর এই গভীরতর অসুখে আমরা প্রস্তুত তাঁর 'সাথ' দিতে।</mark> <mark>ঝাঁপিয়ে পড়লাম সবাই ডাউনলোড করতে 'আরোগ্য সেতু'। আর তার জন্য একান্ত আপন</mark> স্মার্টফোনটি হয়ে উঠলো অত্যন্ত জরুরী। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ভারত বাদে জেগে রইল আর এক ভারত; বিশ্বকর্মার ভারত। যাদের 'টেপা' ফোনে ব্লুটুথ আছে কিনা সন্দেহ, আরোগ্য সেতু তো মঙ্গল গ্রহ। এদিকে অর্থনীতি, শিক্ষা ভেঙে পড়েছে মহামারীর হাত ধরে। স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। বন্ধ সাধারণ পঠন পাঠন প্রক্রিয়া। রিভলবিং চেয়ার থেকে আদেশ এল, অন লাইন পড়াতে হবে। এর জন্য চাই কম্পিউটার বা নিদেনপক্ষে ওই স্মার্টফোনটি। আবার ডাউনলোড জুম, গুগুল ক্লাস রুম ইত্যাদি ইত্যাদি। এক জন মাত্র উপাচার্য মহাশয়ের বিরুদ্ধ মত ছাড়া সবাই মেনে নিলেন বিনা মন্তব্যে। যে মাস্টার মশাইরা এতদিন ছাত্রদের ফোনে সময় কাটানোর জন্য বকাবকি করতেন, এখন তাঁদের ফোনে নানা গ্রাপ, নানা অ্যপ্লিকেশন। স্কুলের সমস্যা দূর হল কিছুটা টিভি চ্যানেলের সৌজন্যে (যদিও कुलात পঢ়াশোনার আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে আকাশবাণীতে হয়ে আসছে)। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু ওই অন লাইন পাঠক্রম। কেউ একবারও ভেবে দেখলো না প্রায় ১১০ কোটি ভারতবাসী কোথায় বাস করে। বাবা, দাদার ভিন রাজ্যে কাজ বা নিজ রাজ্যে সামান্য রোজগারে একটা সস্তার মোবাইল কিনতে পারলেও কম্পিউটার দূর অস্ত। নানা যোজনার হাত ধরে সেই গ্রামে বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা, মোবাইল ফোন পৌঁছলেও পরিষেবা কতটা পাওয়া যায়? এই ভারতের যারা উচ্চ শিক্ষা নিতে কলেজে পড়ে, তারা বড় ছুটিতেও বাড়ি যায় না এই অসবিধার কথা মাথায় রেখে। কিন্তু আজ তারাও বাধ্য হয়ে সন্দরবনের কোন দ্বীপে, উত্তরবঙ্গ বা জঙ্গল মহলের গ্রামে ফিরেছে। আজ তারাও হাতে স্মার্টফোন নিয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী। কিন্তু ওই ব্যতিক্রমী উপাচার্য মহাশয় যে বললেন এই অন লাইন শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে নতুন সামাজিক বৈষম্যের, তা কোথায় হল? সবাই তো কম্পিউটার বা স্মার্টফোন নিয়ে পাঠ নিচ্ছে। প্রশ্নটা এখানেই লাখ নয় কোটি টাকার; "সবাই পাচ্ছে?" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের <mark>সাবধান বাণীতে 'জুম' ছেড়েছেন বা না ছেড়েছেন তা</mark> নিয়ে এদের সমস্যা নেই। এদের সমস্যা অন্যত্র- বিদ্যুৎ থাকা, নেট কানেকশন থাকা এবং সর্বোপরি এদের ফোনের মেমরি। বহু কষ্টে (উপার্জনহীন অবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগান যেখানে অসম্ভব) হয়ত একটা নেট প্যাকও দেওয়া গেল, কিন্তু কমদামী ফোনে স্পেস তো আর বাডানো যায় না। অন্য

সময় অনুপস্থিত ক্লাসের নোটস বন্ধুর খাতা থেকে টুকে নেওয়া গেলেও এখন সে বন্ধুও দূরে। যদিও বা নেটের সাহায্যে বন্ধু তা পাঠালো, কিন্তু পরের ক্লাসকে জায়গা দিতে ওই কমদামী ফোন তা মুছতে বাধ্য হল। অন্যের ঝাঁ চকচকে দামী মোবাইলের পাশে নিজের কমদামী ফোনটা তো আগেই হেরে বসে আছে, আজ নতুন করে সেই গ্লানি ফিরে এল। দূরকে নিকট করার যন্ত্র সৃষ্টি করলো আর এক সামাজিক দ্বীপের। অধ্যাপক/ মাস্টার মহাশয়ের কাছে থেকে দ্বিতীয়বার নোটসটা চাওয়ার মত আত্মসম্মানটাই তখন চুরমার হয়ে গেছে। পরম কল্যাণময় না করুন, পিছিয়ে পড়ার ভয়ে হারিয়ে যেন না যায় কোন মেধা।

এখানেই আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। অন লাইনে ক্লাস নেওয়ার পরেও আমাদের এই ক্লাসগুলো সংরক্ষণ করতে হবে এদের কথা ভেবেই। স্বাভাবিক ছন্দে পৃথিবী ফিরলেই এরাও ফিরবে মাথা নীচু করে আমাদের ক্লাসে। এগিয়ে যেতে হবে আমাদের, তুলে দিতে হবে এদের হারানো ক্লাসের দিনগুলো। তবেই দূর হবে নতুন সৃষ্টি হওয়া বৈষম্যের। না হলে নেট, বিদ্যুৎ বা ফোন স্পেসের অভাবে হারিয়ে যাবে নতুন ভারত গড়ার শিল্পীরা। আমরা আজও এক একটা দ্বীপে বাস করি। এই বৈষম্যের হাত ধরে তৈরি হবে আর একটা দ্বীপ। করোনা পরবর্তী ভারতে আমাদের আর একটা নতুন কাজের দ্বায়িত্ব উপস্থিত। আমার স্থির বিশ্বাস এই দ্বায়িত্ব পালনে আমরা পিছিয়ে যাবো না।



# Certificate



This is to certify that Pingla Thana Mahavidyalaya, Paschim Medinipur, West Bengal is now a Recognized Swachhta Action Plan Institution. The Institution has successfully formed the Swachhta Action Plan Committee and constituted the working groups Post COVID-19 for Sanitation & Hygiene, Waste Management, Water Management, Energy Management and Greenery along with the observation of two environment related days to inculcate in faculty, students and community, the practices of Swachhta and Reduction, Reuse and Recycling of Resources.

Dr. W G Prasanna Kumar Chairman

Mahatma Gandhi National Council of Rural Education Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development Government of India

No.:Cert. 25 /SAP/Paschim Medinipur/West Bengal

# সূচীপত্ৰ

### "এবার কঠিন কঠোর গদ্যে হানো"

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: একটি পর্যালোচনা --- ড. জয়দেব বেরা --- ১১ সম্পর্ক --- ড. গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি --- ১৭ মানব 'মন'- একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন --- ড. সত্যনারায়ণ জানা --- ১৯ Sauca and Samtosa: Application in Modern Life -- Dr. Rajarshi Kayal--- २১ আরাবাড়ি: স্বপ্ন-সৃজন-সফলতা --- অর্পিতা সামন্ত --- ২৪ বর্তমান সমাজে নারীদের অবস্থান --- রামপদ সাউ --- ২৮ ইতিহাসের আলোকে 'মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী --- মূণাল প্রধান --- ৩০ সমস্যা --- অমৃতা মাল --- ৩৩ অন্য বসন্ত --- শ্রেয়সী কুন্তু --- ৩৪ করোনাময় বিশ্ব-- এক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষিত --- শোভন ঘোষ --- ৩৭ বিজয়ী বনাম বিজিত --- মির্জা মোজাম্মিল --- 88 স্বলটাই ভাল ছিল --- সৌরাশিষ রাউৎ --- ৪৮ সমাজ জীবনে ন্যায় নীতি ও মূল্যবাধের অবক্ষয় --- সুদীপ্তা মালা --- ৫৪ পুরানো সেই দিনের কথা --- সমাপ্তি পাত্র --- ৫৮ ৭ই সেপ্টেম্বর: 'নীল আকাশের জন্য নির্মল বাতাস'—আন্তর্জাতিক দিবস -শিল্পা করশর্মা - ৬৯ সীমান্ত --- সভাশীষ মণ্ডল --- ৭০ পরিযায়ী --- গোপাল বেরা --- ৭৬ কার্গিল ৯৯ --- সুমন্ত বেরা --- ৭৮ শেষ আলাপ --- কার্তিক হাজরা --- ৮১

### "এই অরণ্যে কবির জন্যে আমরা থাকি"

সময় ব্যক্তিগত নয় --- ড. সর্বশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় --- ১৬ ফেরা ---- মিতালী ভৌমিক --- ১৬ আশ্রয় --- অধ্যাপক (ড.) প্রকাশ কুমার মাইতি --- ১৮ শৈশবের বিবর্তন --- রাকেশ বেরা --- ২২ নিষ্ঠুর পৃথিবী --- চয়ন কুমার মন্ডল --- ২৩ হয়তো একদিন --- অনুশ্রী গুছাইত --- ২৩ Balance Sheet of life --- Mirja Majammil --- २१ নদীর কান্না --- শঙ্কর দাস --- ৪২ বর্ষা --- সোমা সীট --- ৪৩ সময়ে –অসময়ে --- সুমন বেরা --- ৪৩ মাগো এবার তুমি জাগো --- সোমনাথ ভট্টাচার্য --- ৪৫ তুমি আসবে বলে (২০২০) --- বিশ্বজিৎ আদক --- ৪৬ মুখোশের আডালে --- সরস্বতী বেরা --- ৪৭ তোমার মত বন্ধু পেলে --- সেক নাসিম মহম্মদ --- ৫০ পণ প্রথা --- সেক নাসিম মহম্মদ --- ৫ ১ Naughty Beloved --- Debabrata Utthasini --- ৫२ মা আমার মা --- অনিমা সামন্ত --- ৫২ নব প্রলেপ --- সঞ্জয় প্রামানিক --- ৫৩ Covid-19: Not A Bliss --- Subhasis Mandal --- && মা --- টুম্পা পাত্র --- ৫৭ জীবন --- শ্বেতা ভৌমিক --- ৫৭ প্রিয় মুখ --- পুষ্পেন্দু মণ্ডল --- ৬১ কিছু মন দিলাম --- পরিমল মানা --- ৬২ কলম --- পুম্পেন্দু মণ্ডল --- ৬৬ বাংলা ভাষা --- প্রশান্ত দাস --- ৬৮ পথের দিশা --- মনিদীপা বেরা --- ৬৮ সত্যিই বিস্ময়কর --- সুমন বেরা --- ৭৩ যুগের হাওয়া --- সুমন বেরা --- ৭৪ বন্ধুর খোঁজে --- সৌরভ দাস --- ৭৪ এগিয়ে যাও --- গোপাল বেরা --- ৭৫ মা --- চন্দ্ৰ মাজী --- ৮৪ দিনকাল --- পাপিয়া মন্ডল --- ৮৪

করোনার থাবা --- সোমাশ্রী সামন্ত ---- ৮৫

যানবাহন --- শংকর চক্রবর্তী --- ৮৫
প্রিয় বান্ধবী --- রাহুল দেব বর্মন --- ৮৬
হারানো জিয়া --- সুমন্ত মিশ্র --- ৮৭
প্রথম কলেজ লাইফ --- সুমন্ত মিশ্র --- ৮৭
সুপার সাইক্লোন 'আমপান' --- সাহেব দিন্ডা --- ৮৮
শরৎ --- অনিমা সামন্ত --- ৮৮

### কেমন আছো শিল্প?

মাটির পাত্র নির্মাণ পদ্ধতি ও ব্যবহার প্রকল্প --- গনেশ চন্দ্র পাল --- ৬৩

## "হে বন্ধু, বিদায়"

যত নীল পাগল পাহাড় --- ড. পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য --- ৮৯ তবু অনন্ত জাগে --- অদিতীয়া চৌধুরী --- ৯০

## "এই এবড়ো-খেবড়ো রং"

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর --- দুর্গা বেরা --- ৯১ চাই উড়ান --- শম্পা সিং --- ৯২

### ফটো-সিন্থেসিস

লেন্স: সায়ন্তন দিন্দা --- ৯৩-৯৬

লেন্স: সৌমদীপ মান্না --- ৯৭-৯৮

লেন্স: সঞ্জয় প্রামানিক --- ৯৯-১০০

ফেরা (২০১৯-২০২০) --- ১০১

### জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: একটি পর্যালোচনা

#### ড. জয়দেব বেরা

কো-অর্ডিনেটর, আই.কিউ.এ.সি. এবং সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ২০২০ সালের ২৯ জুলাই ঘোষণা করেছে বহু প্রতিক্ষিত জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০২০। অবশ্য মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক না বলে এখন থেকে বলতে হবে শিক্ষা মন্ত্রক। ইসরোর প্রাক্তন প্রধান ডক্টর কৃষ্ণস্বামী কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ২০১৯ সালের ৩১শে মে তারিখে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে জাতীয় শিক্ষানীতির যে ৪৮৪ পাতার খসড়া জমা দিয়েছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি "লাইটু বাট টাইট্" ৬৬ পাতার সদ্য প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি। অনেকে এই শিক্ষানীতির পক্ষে বলছেন, আবার অনেকে এই শিক্ষানীতির বিপক্ষে বলছেন। তবে এটা ঘটনা যে, জাতীয় শিক্ষানীতির মতো এতো বড় বিষয় ঘোষনার আগে সংসদে কোন আলোচনা হয়নি। শিক্ষা সংবিধানের যুগ্ম তালিকা হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকারগুলোর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্বপ্নে পোলাও খেলে খরচের কথা না ভেবে ভাল ব্রান্ডের ঘী আর চাল দিয়ে বানানো পোলাও খাওয়াই ভাল, তেমনি অর্থ সংস্থান না করে মানুষকে শুধু স্বপ্ন দেখাতে হলে সুন্দর সুন্দর কথা তুলে ধরাই ভাল। অনেক ভালো ভালো কথা বলা রয়েছে এই রিপোর্টে। বিজ্ঞান মনস্কতার কথা বলা আছে, সমতার কথা বলা আছে, অন্তর্ভুক্তিকরণের কথা বলা আছে, শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা বলা আছে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০:১ করার নিশ্চয়তা দেওয়া আছে, শিক্ষা নিয়ে কোনরকম বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য বরদাস্ত করা হবে না বলা রয়েছে ইত্যাদি। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "দি ডেভিল ইস ইন দি ডিটেল" অর্থাৎ, শয়তান লুকিয়ে থাকে বিশদের ভিতর। যেহেতু জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের পর প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং উচ্চ শিক্ষায় আমূল বদল ঘটবে তাই দেখে নেওয়া ভাল জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঠিক কি আছে, আর তার প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে তথা সমাজে কি হতে পারে।

#### বিদ্যালয় শিক্ষা প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী):

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামোকে আমূল বদলে ফেলার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান ১০+২ পদ্ধতির বদলে ৫+৩+৩+৪ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। কে) ভিত্তি স্তর হবে পাঁচ বছরের যার মধ্যে রয়েছে দুটি ধাপ। তিন বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত হবে প্রাথমিকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী। (খ)প্র স্তুতি স্তর (প্রিপারেটরি স্টেজ) হবে তিন বছরের যার মধ্যে থাকবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী।(গ) মধ্য স্তর (মিডল স্টেজ) হবে তিন বছরের যার মধ্যে থাকবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অন্তম শ্রেণী।(ঘ) মাধ্যমিক স্তর (সেকভারী স্টেজ) হবে চার বছরের যার মধ্যে থাকবে আবার দুটি ধাপ। প্রথম ধাপে থাকবে নবম এবং দশম শ্রেণী আর দ্বিতীয় ধাপে থাকবে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী।

আরলি চাইল্ডহ্ড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন (ই.সি.সি.ই.) ব্যবস্থার মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। ভিত্তি স্তরে তিন থেকে ছয়

বছরের শিশুদের দায়িত্ব থাকবে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের। তাঁদের শিক্ষাগত মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা বেশ করুণ। তারা ন্যূনতম বেতন পান না। তাদের পেনশন নেই, নেই কোন সুরক্ষা। তাহলে তারা কিভাবে অনুপ্রাণিত হবেন এই কাজে? দেশের প্রায় ১৪ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন আর তাঁদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ আর বেতনের জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তা আসবে কোথা থেকে?

মাধ্যমিক স্তরে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ন্যাশনাল টেস্টিং এজেনির গাইড মেনে বছরে দুটি সেমেস্টার করে মোট আটটি সেমেস্টারে পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আরও সমস্যা হল দেশের প্রচুর সংখ্যক বিদ্যালয়ে এখন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী পড়ান হয়না। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী চালু হলে পরিকাঠামো ও শিক্ষক সমস্যা কি ভাবে পূরণ করা হবে তা বলা নেই। ফলস্বরুপ অসংখ্য কোচিং সেন্টার গড়ে উঠবে। শিক্ষা ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম বাড়বে। সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়গুলি তাদের গুরুত্ব ও আস্থা হারাবে। স্বীকৃত বোর্ড বা পর্যদের পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে দিয়ে তৃতীয়, পঞ্চম আর অস্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা নেওয়ার দায়ত্ব কোনো একটি মূল্যায়ন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ২০১৭-১৮ সালের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ৭৫.২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট টিউশন নির্ভর।

#### উচ্চশিক্ষা:

জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে তিন রকমের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবেক) গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় (রিসার্চ ইউনিভার্সিটি), (খ) পড়াশুনাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়
(টিচিং ইউনিভার্সিটি), এবং (গ) স্বশাসিত কলেজ (অটোনমাস কলেজ)। আগামীদিনে
সাহায্যকারী (অ্যাফিলিয়েটেড) কলেজ আর থাকবে না। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় তার অধীন
কলেজগুলি যাতে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে তা দেখবে। শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম
বিষয়ে, পড়াশুনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে, আর্থিক স্বশাসনের
বিষয়ে এবং প্রশাসনিক দক্ষতার বিষয়ে ন্যুনতম মানে পৌঁছতে পারে তার চেষ্টা করবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সমস্ত কলেজ ঐ ন্যুনতম মানে পৌঁছতে কিছুটা সময় পাবে। তারপর
ঐ কলেজগুলি পরিণত হবে অটোনমাস ডিগ্রী গ্রান্টিং কলেজ (এ.সি.) অথবা কনসটিটুঅ্যান্ট
কলেজ অফ এ ইউনিভার্সিটি (সি.সি.ইউ)। এই কলেজগুলোর স্বাধীন ডিগ্রী দেওয়ার ক্ষমতা
থাকবে। সোজা কথায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামো ভেঙে ফেলা হবে। উপযুক্ত স্বীকৃতি
নিয়ে এই কলেজগুলি ভবিষ্যতে হবে গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে পারে তা জাতীয়
শিক্ষানীতিতে অস্বীকার করা হয়েছে। পড়াশুনার সঙ্গে গবেষণা সারা পৃথিবীতেই স্বীকৃত।

#### স্নাতক-স্নাতকোত্তর:

স্নাতক স্তর হবে তিন বা চার বছরের। অবশ্য তিন বছর কলেজে না থাকলেও চলবে। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর এক বছর শেষ হলে পাবে সাটিফিকেট, দু-বছর পর ডিপ্লোমা, তিন বছর শেষ হলে পাবে স্নাতক ডিগ্রি, আর গবেষণাসহ চার বছরের স্নাতক হলে স্নাতকোত্তর হবে এক বছর। সোজা কথায় ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝানো যে, কলেজে ভর্তি হলে টাকাটা পুরোপুরি নষ্ট হবে না। যে দেশে দারোয়ান পোষ্টের জন্য হাজার হাজার স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীরা আবেদন করে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সাটিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোন কাজে লাগবে কে জানে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম দিতে পারবে তিন ভাবে: (ক) যারা তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রি পেয়েছে তাদের জন্য দু-বছরের স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম, যার দ্বিতীয় বছর বরাদ্দ থাকবে গবেষণার জন্য, (খ) যারা চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি পেয়েছে গবেষণাসহ তাদের জন্য এক বছরের স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম, আর (গ) পাঁচ বছরের ইন্টিগ্রেডেড স্নাতক/স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম। অবশ্য বাস্তব হল যে, স্নাতক স্তরে গবেষণা করার মত পরিকাঠামো কলেজগুলোতে নেই বললেই চলে। ২০১৮-১৯ সালের অল ইন্ডিয়া সার্ভে অব হায়ার এডুকেশনের (এ.আই.এস.এইচ.ই.) প্রতিবেদন বলছে কেবলমাত্র ২.৫ শতাংশ কলেজে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম আছে।

#### এম, ফिল,-পিএইচ.ডि.:

জাতীয় শিক্ষানীতিতে এম.ফিল. তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে সারা ভারতে ১৮৩৯৬২ জন (২০১৪-১৫ তে ৩৩৩৭১ জন, ২০১৫-১৬ তে ৪২৫২৩ জন, ২০১৬-১৭ তে ৪৩২৬৭ জন, ২০১৭-১৮ তে ৩৪১০৯ জন এবং ২০১৮-১৯শে ৩০৬৯২ জন ) এম.ফিল. কোর্সে নিবন্ধীকৃত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যতের প্রতি অবিচার করা হবে না তো!

সারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামকে নতুনভাবে সাজানোর কথা বলা হয়েছে। পিএইচ.ডি. নিবন্ধীকরনের জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা চার বছরের গবেষণাসহ স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। সমস্ত বিষয়ের পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে নিবন্ধীকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার কাজ চলাকালীন ক্রেডিট-বেসড কোর্স নিতে হবে তাদের পছন্দের গবেষণার বিষয়ে। অতিরিক্ত শর্ত হিসাবে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে নিবন্ধীকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যূনতম ঘন্টা শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা তাদের ডিগ্রী অর্জনে ব্যঘাত ঘটাবে। ২০১৮-১৯ সালের অল ইন্ডিয়া সার্ভে অব হায়ার এডুকেশনের (এ.আই.এস.এইচ.ই.) প্রতিবেদন বলছে কেবলমাত্র ২.৫ শতাংশ কলেজে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম আছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ভারতে গবেষণাখাতে খরচ হয় মাত্র ০.৬৯ শতাংশ, যেখানে আমেরিকাতে হয় ২.৮ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে হয় ৪.২ শতাংশ।

#### ছোট কলেজের অবলুপ্তি:

ইনসটিটুশনাল রিস্ট্রাকচারিং এন্ড কনসোলিডেশন চ্যাপ্টারে বলা হয়েছে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি হবে বড় নানাবিষয়ক (মালটিডিসিপ্লিনারি) বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার ক্লাস্টার/ নলেজ হাব যাদের প্রত্যেকের থাকবে অন্ততঃ ৩০০০ ছাত্র-ছাত্রী। এই ভাবেই ফিরিয়ে আনা যাবে প্রাচীন ভারতের নালন্দা, তক্ষশীলা, বল্লাভী, এবং বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য যেখানে দেশ-বিদেশ থেকে হাজার-হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করতে আসত।বলা হয়েছে ভারতের জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন ঐ মহান ভারতীয় ঐতিহ্য যা সৃষ্টি করবে সৃজনশীল মানুষ, বর্তমানে যা শিক্ষাগতভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে বিদেশে পাড়ি দিছে। কিন্তু ২০১৮-১৯ সালের অল ইন্ডিয়া সার্ভে অব হায়ার এডুকেশনের (এ.আই.এস.এইচ.ই.) প্রতিবেদন বলছে দেশের মোট ৩৯৯৩১ কলেজের মধ্যে ৩০০০-এর বেশি ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে মাত্র ১৫৩৬টি কলেজে - যা মাত্র প্রায় ৪ শতাংশ। ২৪৫৮৪ টি কলেজে বা ৬৪.৪ শতাংশ কলেজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫০০ বা তারও কম। আবার মোট

কলেজের ৬০.৫৩ শতাংশ কলেজ গ্রামীণ এলাকাতে অবস্থিত। তাহলে বোঝাই যাচছে গ্রাম-বাংলার বহু কলেজ আগামী দিনে উঠে যাবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যারা অনায়াসে বাড়ির কাছে কোনো কলেজে ভর্তি হতে পারত তাদেরকে যেতে হবে শহরের বড় কলেজে। বলাই বাহুল্য সেই সমস্ত কলেজগুলির বেশিরভাগ হবে বেসরকারী মালিকানাধীন, যেখানে পড়াশুনার খরচ অত্যন্ত বেশী। কার্যত পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী। আর ধাক্কা খাবে জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বপ্ন দেখানো উচ্চশিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার (গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও) ২০১৮ সালের ২৬.৩ শতাংশ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশতে পৌঁছানো।

#### माल्टि-ডिসिপ्लिनाति वा नाना-विষয়क শिक्षाः

মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি বা নানা-বিষয়ক শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বেছে নিয়ে পড়ার কথা শুনতে যতটা ভালো, রুপায়ন করাটা ততটা সহজ নয়। এই পরিকাঠামো কি সত্যি-ই আমাদের দেশে আছে! তাছাড়া এতে কোন একটি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। রসায়নের সঙ্গে সাহিত্য বা দর্শন পড়লে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার কোথায় লাভ নীতি রুপায়নকারীরা একটু বুঝিয়ে বলবেন? কথায় কথায় আমেরিকা, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়ার সংগে তুলনা করবার সময় ঐ দেশগুলোর সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কত শতাংশ অর্থ ব্যয় করেন আর আমাদের দেশের সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কত শতাংশ অর্থ ব্যয় করেন ভাল হয়।

### হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (এইচ.ই.সি.আই):

উচ্চশিক্ষা আর ইউ.জি.সি. প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল শিক্ষাক্ষেত্রে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ.জি.সি.), অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশান (এ.আই.সি.টি.ই.) -এর মত স্বশাসিত কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থাগুলি তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠন করা হচ্ছে হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (এইচ.ই.সি.আই)। যার ছাতার তলায় থাকবে চারটি সংস্থা - (১) ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশন রেগুলেটরি কাউন্সিল (এন.এইচ.ই.আর.সি.). (২) ন্যাশনাল অ্যাকরিডিটেশন কাউন্সিল (এন.এ.সি.), (৩) হায়ার এডুকেশন গ্রান্টস কাউন্সিল (এইচ.ই.জি.সি.), এবং (৪) জেনারেল এডুকেশন কাউন্সিল (জি. ই.সি.)। এই চারটি সংস্থার মাধ্যামে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণ, আর্থিক অনুদান এবং পড়াশুনার মান যাচাই করা হবে। প্রবর্তন করা হবে শিক্ষা নিরীক্ষা (অ্যাকাডেমিক অভিট), যার মাধ্যমে প্রত্যেকটা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পডাশুনার মান অডিট হবে। চাল হবে সামাজিক নিরীক্ষা (সোশ্যাল অডিট), যার মাধ্যমে সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বছরের আয়-ব্যায়ের হিসাব জনসমক্ষে (অন লাইন এবং অফ লাইন) রাখার নিদান দেওয়া আছে। সোজা কথায় উচ্চশিক্ষার প্রায় সব নিয়ন্ত্রণ থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, যদিও শিক্ষা রয়েছে সংবিধানের যুগ্ম তালিকায়। ন্যাশনাল অ্যাকরিডিটেশন কাউন্সিল (এন.এ.সি.) প্রবর্তন হলে বর্তমান চালু থাকা ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকরিডিটেশন কাউন্সিল ( এন.এ. এ.সি.)-এর কাজ কি হবে সে সম্পর্কে কোনো কথা বলা নেই।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বশাসনের কথা বলা হলেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ.জি.সি.), অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশান (এ.আই.সি.টি.ই.)-এর মত স্বশাসিত কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থাগুলি তুলে দিয়ে উচ্চশিক্ষাকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে চরম কেন্দ্রীকতায়। কোচিং সেন্টারগুলোর রমর্মা ক্যানোর কথা বলা হলেও বিদ্যালয়স্তরে অধিক সংখ্যক পরীক্ষা চাপানোয় ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্য হবে কোচিং সেন্টারেগুলোয় যেতে। যে দেশের বড় অংশের মানুষ "আটা" কিনতে পারেনা তাদেরকে "ডাটা" কিনতে বলা, যে দেশের বড় অংশের মানুষের দুই বেলা "পেট" ভরেনা তাদেরকে "নেট" ভরতে বলে "অন লাইন" ক্লাসে জোর দেওয়া কত্টা যুক্তিযুক্ত তা সরকার ভেবে দেখুক। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর অটোনমাস কলেজ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে অধিক সংখ্যক অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ তুলে না দিলে ১০০টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে শিক্ষা ব্যবসা করবে কি করে? তারা তো সেবা করতে আসছে না, মুনাফা করতে আসছে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে আসলে গরীব বাড়ির ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষাখাতে জি.ডি.পি.- র ৬ শতাংশ খরচের প্রস্তাব খুবই ভাল। তাহলে শিক্ষার সত্যি-ই <mark>উন্নতি হবে। কিন্তু তথ্য বলছে গত বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল জি.ডি.পি.-র মাত্র ০.৪৪</mark> শতাংশ। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভারতে আমন্ত্রণ না করে এই টাকায় দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শক্তিশালী করলেই জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বপ্ন দেখানো উচ্চশিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার (গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও) ২০১৮ সালের ২৬.৩ শতাংশ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশতে পৌঁছবে, আর তাহলেই, "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

### সময় ব্যক্তিগত নয়

#### ড. সর্বশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী অধ্যাপক, <mark>ইতিহাস বিভাগ</mark> পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সময় আর ব্যক্তিগত নয়,
ফিসফিসিয়ে কথা বলে সবাই—
জমিয়ে রাখা হাজার অনুভব,
নিমেষে চুরমার নীরব ইঙ্গিতে।
তবুওতো থেমে থাকে না চলন,
ইচ্ছেমতো হিসেবের খাতা ভরে —
অনন্ত গোপন অশান্ত জিহ্বা,
সক্রিয় হয় সকল অস্থিরতায়।
'সবঠিক' হয়ে যায় উলট পুরাণ!
এখনও অন্য পৃথিবীর আলো,
সকল মিথ্যাকে পরাভূত করে।
অমৃতের সন্তান আছে প্রহরায় —
আবার বিশ্বাসে নিঃশ্বাস ভরে,
গর্ভবতী হয় সকল মঙ্গলকাব্য!



#### ফেরা

#### মিতালী ভৌমিক

দ্বিতীয় সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

তুমি যতবার জিতেছ, আমি ততবার হেরেছি;
সভ্যতার ঘর খুঁজতে খুঁজতে শকুনের ঝাপটা খেয়েছি!
নিষেধের বেড়াজালে এক ধ্বংসের বীজ দেখেছি,
শুনেছি তাদের হাহাকার!!
তবুও বলতে পারিনি...
মৃত্যু, তুমি বড় সুন্দর একটুকরো আকাশ...
এই দুর্গম পথে এক অসম্পূর্ণ বেয়াকেল্লে অভিমান
কত সহস্র বছর পর শ্বাস রোধ করে,
অন্ধকারে জোয়ারের মতো ফিরে ফিরে আসে...!

### সম্পর্ক

### ড. গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি

সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, কল্যাণী মহাবিদ্যালয় (প্রাক্তন রীডার, গণিত বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়)

সম্পর্ক একটি শব্দ যা দিয়ে যে কোনো দুটি জিনিস জুড়ে দেওয়া যায়। যেমন- ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক, মা মেয়ে সম্পর্ক, চিকিৎসক রুগী সম্পর্ক আবার লোহা চুম্বক সম্পর্ক। আমি যে সম্পর্ক নিয়ে বলব তা হল আত্মীয়ের সম্পর্ক। প্রায়শই লোককে বলতে শোনা যায় জানেন তো, আমি না ঠিক সম্পর্ক বিষয়টা বুঝি না। সত্যি কি তাই? তাহলে তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি পিতা পুত্রের সম্পর্ক বোঝেন? হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে যেমন জল পাওয়া যায়, সে রকম সব সম্পর্কই কিছু মৌলিক সম্পর্কের সময়য়। এই সম্পর্কগুলি স্বামী-স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতা। গণিত শাস্ত্রে inverse বলে একটি কথা আছে, যাতে বলা হয় ৩ এর inverse ১/৩ বা অন্য ভাবে -৩, তেমনি বাবা মার বিপরীত সম্পর্ক সন্তান। এবার কিছু সম্পর্ককে মৌলিক সম্পর্ক করে দেখানো যাক। ধরুন আপনি এক জন পুরুষ, আপনার শৃশুরমশাইকে যদি মৌলিক সম্পর্ক দিয়ে বলতে হয়, তা হবে স্ত্রীর পিতা। আবার পিসতুতো ভায়ের ক্ষেত্রে হবে পিতার পিতার কন্যার পুত্র। দেখুন এখানে সমস্তটাই মৌলিক সম্পর্ক দিয়ে প্রকাশ করা হলো। তবে হয়াঁ অনেক সহজ সম্পর্ককে জটিল করে বলা যায়, যেমন, কাউকে প্রশ্ন করুন পিসেমশাই এর শৃশুরমশাই কে? উত্তর আসবে ঠাকুরদা। যারা পাটিগণিত অন্ধ করতে ভালোবাসেন, তারা এগুলো বিশ্লেষণ করতে ভালো পারবেন, এতে মস্তিষ্কের ব্যায়াম হবে।

এবার একটু মজার প্রশ্ন করি, বলুন তো বাবার খুড়তুতো ভাই কি ছেলের মাসতুতো ভাই হয়? হয় বৈকি, যদি বাবা ও তার কাকার একই বাড়ির দুই বোনের সাথে বিয়ে হয়। দক্ষিণ ভারতে মামা ভাগ্নির বিয়ের রীতি আছে, সেখানে এমন তালগোল পাকানো সম্পর্ক তৈরি হয় ভাবতে গেলে মাথা জট পাকিয়ে যাবে। জামাইবাবু হবেন শ্বশুরমশাই, দিদি হবেন শ্বশুড়ি আর ভাগ্নে হয়ে যাবেন মামাতো ভাই।

এবার আসছি অন্য কথায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আধুনিক মানুষের (Homo sapiens sapiens) উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে তিন লক্ষ বছর আগে মরক্কোতে। আমরা সবাই তাদের থেকে এসেছি। যদি ভাবা যায়, একটি প্রজন্মের সাথে পরের প্রজন্মের গড়ে ৩০ বছরের তফাৎ, তবে ৬০০ বছরে ২০ টি প্রজন্ম হবে। আমার বাবা মা, যাদের থেকে আমি এসেছি তারা দুজন, আবার তাদের বাবা মা ২x২=৪, তাদের বাবা মা 8x২=৮, এভাবে ৬০০ বছর আগে আমার পূর্ব পুরুষ এর সংখ্যা হবে প্রায় দশ লক্ষ। আমার স্বজাতির আরেক জনের একেবারে আলাদা দশ লক্ষ পূর্বপুরুষ থাকা সম্ভব নয়, তার মানে বেশির ভাগটাই এক হবে, যা খুঁজে বের করা অসম্ভব। তাই আসুন, আমরা সবাই সম্পর্কিত হয়ে বিশ্ব মানব বন্ধনে আবদ্ধ হই।

#### আশ্রয়

### অধ্যাপক (ড.) প্রকাশ কুমার মাইতি

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন অধ্যাপক, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ওর মনেও তো ইচ্ছে ডানা নিজের কুঁড়ে ঘর ওর চোখেও তো ছোট্ট গাঁ-টি খেলার সবুজ মাঠ ওর স্মৃতিতেও চাচেরা ভাই, বোনের খুনসুটি সন্ধ্যে বেলায় গা ছমছম ভূতের ভয়াল গন্ধ গরম গরম পোড়া রুটি সঙ্গে বাইগন দেড়শ কিমি মাত্র তো পথ পিছে লঙ্কা ক্ষেত সবুজ সবুজ গাছের মাথায় লাল মির্চির ঝুঁটি দিনের শেষে জামলো পায় তিনটে দশের নোট।

নরম তোমার ছোট্ট পায়ে উপল ভরা পথ ওই দেখা যায় পলাশ রাঙা টিলার বাঁকা চূড়া ওর পরেই কি সোনার গাঁ-টি বাবার চোখে জল খুশির ঝিলিক জামলো ছোটে মাত্র ঘন্টা কয়...

হা ঈশ্বর! আর কত পল তিন রাত তো পার জামলো গোনে একদশ সাত...ছয়...পাঁচ...চার জল শূন্য ছোট্ট শরীর শুকনো পাতার শয্যা উজীর মারি নাজির মারি আছে কি আর লজ্জা?



পিরিযায়ী শ্রমিক জামলো মকদমির (১২ বছর বয়স) স্মৃতিতে। সে তেলেঙ্গানায় লঙ্কাবাগানে শ্রমিকের কাজ করত।

### মানব 'মন'- একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ড. সত্যনারায়ণ জানা সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আমরা মানুষ, আমাদের মন আছে। মানুষের মনের গোপন রহস্যের কথা কে না জানতে চায়? এ রহস্য কত যে গভীর, কত বিচিত্র, --তা ভাবতেও পারা যায় না। রহস্যজনক বলেই মানুষের মনকে মানুষ জানতে চেষ্টা করেছে সেই আদিকাল থেকে। কিন্তু মানুষের মনকে জানার এত সাধনা সত্ত্বেও আমরা ততদিন অজানার অন্ধকারেই ছিলাম, যতদিন সিগমন্ড ফ্রয়েড (Freud) অস্ট্রিয়ায় ১৮৫৬ সালের ৬ই মে সকাল ৬:৩০ মি: আমাদের কাছে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনের অজানা দুই প্রকোষ্ঠের —অবচেতন ও অচেতন মনের দ্বারোদ্যাটন না করতেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে তাই ফ্রয়েড একটি চিরস্মরণীয় নাম।

ফ্রয়েডের মতে আমাদের মন তিনটি স্তরে বিভক্ত— চেতন, অবচেতন এবং অচেতন।

- (ক) চেতন: আমরা যখন স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে মগ্ন হই তখন আমরা যা নই এবং জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা হই, তাই হল চেতনা। আমরা যখন ধীরে ধীরে স্বপ্নহীন ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে থাকি, তখন আমরা ধীরে ধীরে যা হারাতে থাকি এবং গভীর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠে আসার সময় ধীরে ধীরে আমরা যা ফিরে পেতে থাকি তাই হল চেতনা। চেতনার কেন্দ্র থেকে শুরু করে চেতনার পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে চেতনার ক্ষেত্র বলা হয়।
- (খ) অবচেতন (Sub-concious): চেতনার কেন্দ্রের পর থেকে শুরু করে চেতনার পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে অবচেতন বা (Sub-concious) বলে। ফ্রয়েড এই ক্ষেত্রটির নাম দিয়েছেন আসংজ্ঞান। আমরা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের কথা ভুলে যাই, আবার একটু চেষ্টা করলেই এসব বিষয় স্মরণ করতে পারি। যেমন, স্মৃতি, অভ্যাসজাত ক্রিয়া ইত্যাদি।
- (গ) অচেতন (Un- concious): অবচেতন মনের পরে আর একটি গভীরতর স্তর আছে যার সম্পর্কে জাগ্রত অবস্থায় আমরা সম্পূর্ণভাবে অচেতন। ফ্রয়েড মনকে একটি ভাসমান বরফ স্তুপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই ভাসমান বরফের স্তুপের এক-দশমাংশ জলের উপরে প্রত্যক্ষ গোচর হয়, বাকি নয়-দশমাংশ জলের নিচে থাকে। অনুরূপভাবে, আমাদের মনের চেতনলোকের নীচে একটি গভীরতম অবচেতন স্তর আছে, যা আমাদের চেতনলোককে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েড মনের এই অন্ধকার তলকে অবচেতন মন আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে শৈশবকাল বা তারও পরে, ব্যক্তির অনেক অন্যায় কামনা-বাসনা স্বাভাবিক ও সমাজ-অনুমোদিত পথে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় না। শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতির ভয়ে এই সব অন্যায় কামনা-বাসনা অবদমিত (Repressed) হয়ে অচেতন মনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে। কিন্তু স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হতে না পেরে বিকৃত রূপ নিয়ে ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে ভুলভ্রান্তি, স্বয়্ন, মানসিক রোগ প্রভৃতির মাধ্যমে এগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে। কাজেই ফ্রয়েডের মতে, অচেতন মন অবদমিত ইচ্ছার আশ্রয়ন্তন।

ফ্রয়েড মনে করেন, মনের গঠন বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা করতে হলে মনের সদা সক্রিয়তাকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। মনের সক্রিয়তার তিনটি ভাগ হলো এক আদম্ বা ইদ্(ID), অহম্ বা ইগো(Ego), অধিসত্তা বা সুপার ইগো(Super-Ego)।

- (১) ইদ্ ব্যক্তির কামনা-বাসনা ও আদিম প্রবৃত্তির প্রতীক। সুখ ভোগের নীতির দ্বারা ইদ্ পরিচালিত হয়। এই প্রকৃতি পাশবিক। কোন যুক্তিতে বিশ্বাসী নয়। সামাজিক ন্যায়—নীতি তার কাছে অর্থহীন। সমস্ত অবাঞ্ছিত কামনা—বাসনা যা সমাজে অনুমোদিত নয়, সেগুলিকে ইদ্ অবদমিত করে অচেতন মনে সঞ্চিত করে। যৌন প্রবৃত্তির সকল শক্তি এতে জমা থাকে।
- (২) ইগো সচেতনভাবে ইদ্-এর আদেশ পালন করে। নৈতিক নির্দেশগুলো ইগো মেনে চলতে চায়। স্থান-কাল একমাত্র ইগোই বুঝতে পারে। ইগো বাস্তবতা বজায় রাখতে চায়। আমাদের ঘুমের মধ্যে ইগো যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ইদ্ তার খেয়াল খুশি মতো যাতে তার ইচ্ছা (কামনা—বাসনা) চরিতার্থ (স্বপ্নে) করতে না পারে, সেজন্য প্রহরী সেনসর্স রেখে দেয়।
- (৩) সুপার ইগোর উৎপত্তি ইগোর থেকে। এটি ইগোর সমালোচনা করে এবং তাকে পরিচালনাও করে। এটি ইদ্-এর বিপরীত ধর্মী। আমাদের বিবেককে অনেকে সুপার ইগো বলে থাকেন। ফ্রয়েড বলেন যে, ঘুমের ঘোরে যখন সুপার ইগো এবং Censor বা প্রহরী ক্লান্তি অনুভব করে, তখনই ইদ্ তার মধ্যে থাকা অবাঞ্ছিত কামজ—বাসনাগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি এবং বিকৃতভাবে মনের চেতনা স্তরে এনে দেয়। ফলে আমরা নিদ্রার মধ্যে মনের চেতনলোকে বিকৃত কামজ স্বপ্ন দেখি।

সবশেষে, মনে রাখতে হবে যে, মন এমন জিনিস নয় যাকে ছুরি দিয়ে আপেল কাটার মতো ভাগ করা যায়। চেতন, অবচেতন ও অচেতন এমন তিনটি প্রকোষ্ঠ নয় যাদের মধ্যে যাতায়াত নেই। তেমনি ইদ্, ইগো, সুপার ইগো এমন নয় যে, এদের মধ্যে সম্পর্ক নেই। অংক কষে মনকে এমন বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায় না। মন হল একক। একই মনের বিভিন্ন দিকগুলো বোঝার জন্যই কেবলমাত্র বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে।

# Śauca and Saṃtoṣa: Application in Modern Life Dr. Rajarshi Kayal

Assistant Professor, Department of Physical Education, Pingla Thana Mahavidyalaya

Śauca and Saṃtoṣa – these two words are in Niyamas in Patanjal "Yoga Sutra". Śauca means cleanliness or purification. It is of two types – External and Internal. External purity is related to cleanliness of our body. Internal cleanliness is related to mind – thoughts and intentions. On the other hand, Saṃtoṣa means contentment. According to Maharshi Patanjali, we have to be satisfied with whatever we have or whatever the situation is, but it doesn't mean to accept bad situation rather we should strive to improve them maintaining contentment or excel ourselves.

Now-a-days, we are repeatedly rubbing our hands with or without causes. We suspect others for carrying 'virus'. We repeatedly blame others as the cause of our unhappiness. Somehow we are worried about our situation and future. We are not satisfied with us, our life style or even we blame our destiny too.

We are very much aware about the term 'sanitization' due to the present scenario of pandemic. In the form of Śauca, Rishi Patanjali said it around five thousand years ago. Apart from this, he emphasized on the internal purity for achieving happy disposition. At the same time, a question is obviously come up. Are we satisfied with our present status or situation? Should we 'fight'?

Different answers may arise. If yes, then shall we not proceed further or not to encourage creativity! Here is the conflict. How far shall we proceed? A primary school teacher may prepare himself or herself to be absorbed in the teaching post of high school, college or even university. A bright student of engineering may establish him/her in the 'challenging' film industry. Some of us may be able to shine, some may not or even someone quits even after achieving 'stardom'. There may be so many reasons, so many arguments and counter arguments, but frequently we step into different traps intentionally or accidentally.

If we do not follow 'Samatvam' - the balanced state, in the practical world, then there will be so many reasons of quitting. Almost every year, we have to lose our beloved students for quitting lives. We want no more such news in the sessions ahead.

### শৈশবের বিবর্তন

#### রাকেশ বেরা

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, শারীরবিদ্যা বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

শৈশবে বর্ষা ছিল, নিম্নচাপ ছিল না। ছিল ঝরঝর দিনে স্কুল কামাই। এখনকার মতো পাবজি গেম ছিল না, কিন্তু (थला ছिल, (थलना ছिल ना। তাই আমরা কাগজের নৌকা বানিয়ে বাড়ির সামনে উঠোনে বৃষ্টির জলে নৌকা ভাসাতাম। খিচুড়ি ছিল অবধারিত আর ডিম ভাজা কম পড়লে মায়ের কাছে পাওনা বুঝে নিতাম। সেই সময় স্কুলে এত প্রজেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট লেখার চাপ থাকত না। এর পরেই আছে কাশফুল, সেটা এখনো আছে। এখনকার মতো সেলফি আর পেছনে কাশফুলের ভেলকি ছিল না। বর্ষার ছুটিতে কেশব নাগের অংক ছিল , পি. কে. দে'র ইংরেজি ছিল। এমন বর্ষাতে বেগুনি আর মুড়ি ছিল, ছিল কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমানো। ছপাৎ ছপাৎ বাড়ির ছাদে দাবানো ছিল গল্প দাদুর আসর। এল ই.ডি আলোর বদলে ১০০ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলত। জ্যামিতির বাক্সকে কানে ধরে 'হ্যালো হ্যালো' বলা ছিল। জীবনবোধের সহজ পথে চলা ছিল। থিম ছিল না , মা ছিল , এক চালাতেই দেখা দিত, কুপন ছাডাই প্রসাদ দিত। সব হারালাম, এগিয়ে গেলাম, হরেক রকম ফন্দি। जीवन वाज मुक्टीरकात वनी।

# নিষ্ঠুর পৃথিবী

চয়ন কুমার মন্ডল

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ভূগোল বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

তুমি কেন নিয়ে জন্ম?
এই বর্তমান নিষ্ঠুর পৃথিবীতেতোমারে কেউ দেবে না খাদ্যের সংস্থান,
দেবে না বেঁচে থাকা নুন্যতম স্থান,
তুমি প্রতিটি পদে পদে অবমাননায়–
বড় হয়ে উঠবে নিজ মহিমায়,
কিন্তু তোমারে কেউ দেবে না সম্মান।

বসুধরার বুকে সবাই জন্মগ্রহণ করে, ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ না করে, তোমারে দেবে কর্দমাক্ত পথে ঠেলে, তুমি পারবে না এর প্রতিবাদ করতে, পারবে না ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। তুমি একজন অসহায়তার প্রতীক।

যখন তুমি বনস্পতি রূপে দন্ডায়মান, তখন তোমায় ঘিরে থাকবে অনেক বৃক্ষলতা। কালের পরিহাসে তুমি যখন নিঃস্ব, তখন তোমায় ওদের হতে করবে বিচ্ছিন্ন।

আর শিক্ষা!
তা হতে তুমি থাকবে অনেক দূরেপারবে না এই জ্ঞানের আলোয় উন্মোচিত
হতে,
বর্তমানে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে।
সত্যি কি নিষ্ঠুর সমাজ!
সত্যি কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

### হয়তো একদিন

অনুশ্ৰী গুছাইত

প্রাক্তনী, জীববিজ্ঞান বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

হয়তো কোনো একদিন
ঠিকই দেখা হয়ে যাবে,
রক্তে ভেজা মলিন পৃথিবীর বুকে।
ঝরে গেছে অনেক জীবন,
ক্ষত বিক্ষত দৃষণে ভরা মন,
তবুও মুখোমুখি,
আলাপন বদ্ধ আনকোরা সময়।
শুধু বেঁচে থাকার কামনায়
মরে যেতে যেতে মনে হয়,
হোক না নতুন করে পরিচয়।

হয়তো একদিন
জীবন গাড়িতে চলেছি জীবনের পথে,
চেনা অচেনা নানা মুখ সাথে।
মুখোশ খুলে দেখি,
সামনে এসে দাঁড়ালে
অনাবিল হাসিতে ভরিয়ে হৃদয়,
চিনে নিতে ভয় হয়।
অশান্ত দুটি চোখ পাহাড় ভেঙে
করেছে শপথ,
জীবন যুদ্ধে মেনে নেবে না পরাজয়।

# আরাবাড়ি: স্বপ্ন-স্জন-স্ফলতা অর্পিতা সামন্ত

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ভূগোল বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

"You cannot protect the environment unless you empowered people, you inform them and you help them understand that these resources are their own, that they must protect them."- Wangari Maathai (Nobel Laureate in Peace, 2004)

মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে মেদিনীপুর-রাণীগঞ্জ জাতীয় সড়কের ধারে দেখা মেলে যে সুবিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের, তার নাম আরাবাড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চল, যার বিস্তার সেই ঝাড়খন্ডের দলমা ফরেস্ট রেঞ্জের সীমানা পর্যন্ত। শালবনী এলাকার শাল গাছের এই জঙ্গলের গহন গভীর রূপ কিন্তু আদতে এক ফিনিক্স পাখির পুনরুজ্জীবনের গল্প। কোনো নির্জন স্তব্ধ সন্ধ্যায় ওই বনভূমির বুকের উপরে দাঁড়িয়ে বন মর্মরে কান পাতলে শোনা যাবে আরাবাড়ির অকথিত আখ্যান।

<mark>গত শতাব্দীর সাতের দশকের একেবারে গোড়ার কথা। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে তখন</mark> রাজনৈতিক ডামাডোল এবং উগ্রবাদীদের দাপট। সেই ক্রান্তি কালে অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক তরুণ বনাধিকারিক, ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসারের দায়িত্ব নিয়ে এলেন মেদিনীপুরে। আদর্শবাদী অফিসারের চোখে সৃষ্টিশীলতার স্বপ্ন, মনে নতুন কিছু করার তাগিদ। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর নজরে এল এই আরাবাড়ি অঞ্চল। ততদিনে আদিম প্রকৃতির আশীর্বাদ পুষ্ট এই অরণ্যভূমি ধ্বংস হতে হতে প্রায় ন্যাড়া মরুতে পরিণত হয়েছিল। তার পেছনে অবশ্য অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান। এই অঞ্চলের হতদরিদ্র অধিবাসীরা <mark>ইতিহাসের জন্মলগ্ন থেকেই জীবন ধারণের জন্য এই শাল জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।</mark> বাড়ি-ঘর তৈরি থেকে শুরু করে জ্বালানী সংগ্রহ, গৃহপালিত পশুচারণা এবং গাছ কেটে বিক্রি করে তাঁরা বনভূমি প্রায় সাফ<sup>্</sup>করে এনেছিলেন। জঙ্গল কেন্দ্রিক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জাদু দন্ড ছিল ওই বনভূমি। যুগ যুগ ধরে তাঁদের তিমিরাবৃত অবস্থার যেমন পরিবর্তন হয়নি, বা বলা ভাল পরিবর্তন করার চেষ্টা হয়নি, তাঁরাও তেমনি <u>এই অতুল বনজ সম্পদকে মন্থন করতে করতে নিঃশেষই করে ফেলেছিলেন। অজিতবার</u> দেখলেন যে এই রকম চলতে থাকলে এই বনাঞ্চলের অরন্য সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র খুব শীঘ্রই ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে আর জঙ্গল নির্ভর বাসিন্দারা তখন আক্ষরিক অর্থেই পথে বসবে। এই সব ভেবে অজিতবাৰু বিচলিত হয়ে পড়লেন। পাশে পেলেন আরেক পদস্থ বনাধিকারীক সুবিমল রায়কে। তাঁরা ভাবলেন যদি স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে নতুন বনাঞ্চল তৈরি এবং সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে জঙ্গল ও মানুষ উভয়কেই রক্ষা করা যাবে।

তাঁদের ভাবনার তাত্ত্বিক দিকটি খুবই উর্বর হলেও মূল বাধা ছিল বাস্তবায়ন।
এত দিন যেসব গ্রামবাসীরা জঙ্গলকে প্রায় পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞানে নির্বিচারে ধ্বংস করেছেন
তাঁরা কি রাতারাতি সেইসব রক্ষায় মন দেবেন? তবে উপায় একটাই, স্থানীয় বাসিন্দাদের
এই সত্যটা পাখি পড়ার মতো করে উপলব্ধি করানো যে, জঙ্গল বাঁচলে তাঁরাও বাঁচবেন এবং
জঙ্গল থেকেই তাঁদের দৈনিক চাহিদা মিটবে এবং উপার্জনও হবে। অজিতবাবু ও সুবিমলবাবু
পায়ে হেঁটে হেঁটে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে গিয়ে জনসাধারণকে এই কথাটাই বোঝাতে শুরু
করলেন – পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও (পরবর্তী কালে দেখা গেছে, আরাবাড়ির
সাফল্যের পেছনে মহিলাদের অবদান পুরুষদের থেকে কোনো অংশেই কম ছিল না)। আস্তে
আস্তে গ্রামবাসীরা উপলব্ধি করলেন অজিত বাবুদের প্রস্তাবের সারবন্তা। তখন চূড়ান্ত করা
হল প্রকল্পের রূপরেখা এবং তা গ্রামবাসীদের মতামত নিয়েই। কাকতালীয় ভাবে এই সময়
কেন্দ্রীয় সরকার 'সামাজিক বন সূজন' প্রকল্প গ্রহণ করলেন। সেই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা
হল এটিকে।

আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা হ'ল 'আরাবাড়ি সামাজিক বন সুরক্ষা কমিটি'। বনাঞ্চল লাগোয়া ১১টি গ্রামের ৬১৮টি পরিবারকে যুক্ত করা হ'ল এই কমিটিতে। গ্রাম গুলি হ'ল – চাঁদমুড়া, সাতশোল, মাঝিগড়, সাকরই, সাফাডিহা, গুতিয়ামারা, সখিশোল, গুঁচিশোল, উরামি, জোড়া কেউদি ও মহিষডুবি। গ্রামবাসীরা এককাটা হয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন নতুন গাছ লাগাবার ও সেই গাছ বাঁচাবার। পরিবর্তে তাঁরাও পেলেন জঙ্গলের কিছু কিছু সম্পদ ব্যবহারের অধিকার, যেমন – জ্বালানীর যোগান, পশু চারণের তৃণভুমি ইত্যাদি। শাল গাছের পাশাপাশি মহুয়া. আম, নিম, ইউক্যালিপটাস, সেগুন প্রভৃতি গাছও লাগানো হল। তা ছাড়া গ্রামবাসীরা বনের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় বাবুই ঘাস, পাট, মাশরুমে ইত্যাদির চাষ শুরুকরলেন। বাঁশ গাছও লাগানো হল। বাবুই দড়ি, বাঁশের ঝুড়ি, মাশরুমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন শুরু হল। কমিটির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামবাসীরা, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ পেতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সেই রুক্ষ, নগ্ন প্রান্তর ক্রমশ আবার সবুজ বনানী শোভিত হয়ে উঠতে লাগল। গ্রামবাসীরা জান-প্রাণ দিয়ে লড়ে যাচ্ছিলেন গাছ বাঁচানোর জন্য। 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' – এই কবি বাক্য যেন ভিন্ন ভাবে মূর্ত্ত হয়ে উঠল আরাবাড়ির বুকে।

১৯৭১ সালে (মতান্তরে, ১৯৭২ সালে) শুরু হয়েছিল এই জঙ্গল বাঁচানোর সংগ্রাম। আর প্রত্যাশিত সাফল্য এল ১৯৮৭ সালে। সেই বছরই প্রথম জঙ্গলের একটি অংশের কাঠ বিক্রি করে, লভ্যাংশের ২৫% সমান ভাবে বন্টন করা হল গ্রামবাসীদের মধ্যে। প্রত্যেক গ্রামবাসী মাথাপিছু ৭০০ টাকা করে পেলেন । অর্থের পরিমাণটি খুব বেশি না হলেও সে ছিল তাঁদের 'সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান'। তাই সে দিন আনন্দের ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছিল সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলি। সফল হল আরাবাড়ি মডেল। স্বপ্ন সার্থক হল অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এই সাফল্যে উৎসাহিত কেন্দ্রীয় সরকার আরাবাড়ি মডেল প্রয়োগ করলেন হরিয়ানায়। সেখানেও এল সাফল্য। গ্রামবাসীদের দিয়ে বন সৃজন ও রক্ষা করার এই ব্যবস্থাকে 'যৌথ বন ব্যবস্থাপনা' বা 'Joint Forest Management' (সংক্ষেপে JFM) নাম দিয়ে ভারত সরকার ১৯৯০ সালে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য এক নির্দেশিকা জারি করেন, যা এখনও সারা দেশে অনুসৃত হয়।

ক্রমশঃ আরাবাড়ি মডেলের কথা দেশের গন্তি ছাড়িয়ে পড়ল বহির্বিশ্বের আঙ্গনায়। এল বিরাট মাপের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ১৯৯২ সালে বিশ্ব খ্যাত 'J. Paul Getty Wildlife Conservation Prize' পেল 'পশ্চিমবঙ্গ বন সুরক্ষা কমিটি' যা আদতে 'আরাবাড়ি বন সুরক্ষা কমিটি'। পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজের সমতুল্য এই পুরস্কারটি তার আগে মাত্র এক বারই এসেছিল ভারতে – ১৯৭৫ সালে প্রবাদ প্রতিম পক্ষীতত্ত্ববিদ ডাঃ সালিম আলি'র পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে। হোয়াইট হাউসের লনে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন যখন এই পুরস্কার তুলে দিচ্ছিলেন আরাবাড়ির মেঠো মেয়ে-পুরুষদের হাতে, যাঁরা নিজেদের দেহাতি মাতৃভাষার বাইরে একটি বর্ণও জানতেন না, তখন বাংলা তথা ভারতের মুখ আরও একবার বিশ্বের দরবারে গৌরবোদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল এই মহার্ঘ্য শিরোভূষণের স্বর্ণাভায়।

একটি পরিসংখ্যান বলছে অজিতবাবুরা কাজটি শুরু করেছিলেন ১২৭২ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে, এখন যার আয়তন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৬০২ হেক্টর। বন সুরক্ষা কমিটি এখন ৪০% শতাংশ লভ্যাংশ পায়। সেই লভ্যাংশ থেকে গ্রামবাসীরা যেমন লাভবান হচ্ছেন, তেমনি গ্রামগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ণেও ব্যয়িত হচ্ছে। এক দিন যাঁরা পেটের দায়ে চোরা-গোপ্তা গাছ কেটে বিক্রি করে দিতেন, তাঁরাই আজ বন দপ্তরের সম্পদ। শুধু বন দপ্তরের নয়, দেশেরও সম্পদ।

পর্যটক প্রিয় আরাবাড়ি আজ সারা বিশ্বেই সমাদৃত, তবে শুধু 'যৌথ বন ব্যবস্থাপনা' বা 'Joint Forest Management' এর উদ্গাতা হিসাবে নয়; আরাবাড়ির প্রাসঙ্গিকতা এখানেই যে, সে আমাদের শিখিয়ে দেয় 'দশে মিলি করি কাজ / হারি জিতি নাহি লাজ'; সে আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর / অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'; সে আমাদের জানিয়ে দেয় 'ফিরে চল্, ফিরে চল্, ফিরে চল্ মাটির টানে / যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে'।

(তথ্যসূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া ইত্যাদি)

#### **Balance Sheet of life**

#### Mirja Majammil

State Aided College Teacher, Department of Commerce Pingla Thana Mahavidyalaya

Our Birth is our Opening balance. Our Death is our Closing balance. Honesty and Faith are our Intangible assets. Work and Behaviour are our Goodwill. Education is our Patent. Commitments are our Investments. Heart is our fixed asset. Character and Moral are our stock in trade. Patience is our Interest Earned. Prayers are our deposit account. Happiness and sorrows are our current accounts. Smiles are our prepayment. Excuses are our overdraft. Sympathy is our creditors. Tears are our interest paid. Suffering and pain are our taxes. Apology is our Accrual. Promises are our loan. Kisses are our dividend. Ambitions are our convertible Loan. Achievements are our capital. Gifts are our Bonus share. Experience is our General Reserve.

Our life partner is our suspense account. Always remember GOD is our Auditor.

### বর্তমান সমাজে নারীদের অবস্থান

#### রামপদ সাউ

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

একটি মেয়ে জন্ম থেকে বড় হয়ে ওঠা ,জীবনযাপন সবই নির্ভর করে সমাজের গঠন,কাঠামো ও প্রকতির উপর। নারী নির্যাতন ও তার প্রতিকারের চেষ্টা নারীর। সমানাধিকার ,নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা , ভাষণ, অঙ্গীকারের অন্ত নেই, কিন্তু হাতে গোনা কয়েক জনের কথা বাদ দিলে, আপামর নারীর অবস্থা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থেকে গিয়েছে। আমাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়ের জন্ম মানেই পরিবারের ভয়, নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা। মেয়ে মানেই দুর্বল, যা তাকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। সমাজ নিজের প্রয়োজনে ছোটোখাটো পরিবর্তন এনে মেয়েদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিলেও মুল কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। বদলায়নি সমাজের মানসিকতাও। থমসন রয়টার্সের একটি রিপোর্ট অনুসারে, ভারত মহিলাদের জন্য বিশ্বের চতুর্থ বিপদজ্জনক দেশ। ৯ই মার্চ ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের একদিন পরে রাজ্যসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস হয়, যা ভারতের সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ করে। যদিও অধিকাংশ রাজ্যে তা কার্যকর হয়নি।

যদিও ভারতে মহিলা সাক্ষরতার হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবু কাঙ্খিত হারে সাক্ষরতা এখনও বাড়েনি। সাক্ষরতার হার নারীদের ক্ষেত্রে ৬০.৬% এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৮১.৩%। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ৯.২% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের দশ বছরের বৃদ্ধির তুলনায় কম। যদিও ভারত সরকারে 'বেটি বাঁচাও,বেটি পড়াও', পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কন্যাশ্রী' ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সাম্প্রতি চালু হলেও এর সুফল এখনও আমাদের ভারতীয় সমাজে সামাজিক সচেতনতার অভাবে পুরোপুরি সফলতা পায়নি। ইউনিসেফের বিশ্বের শিশুদের অবস্থা, ২০০৯ এর প্রতিবেদন অনুসারে, ২০-২৪ বছর বয়সী ৪৭% ভারতীয় মহিলা ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে করেন। গ্রামাঞ্চলে তা বেড়ে হয় ৫৬%। রিপোর্টে আরও দেখানো হয়েছে যে পৃথিবীর ৪০% বাল্যবিবাহের ঘটনা ভারতে ঘটে থাকে।

এখন দেখা যাক নারীরা আজ আমাদের সমাজে কেমন আছেন:

\*নারীদের সব পরিশ্রমের মধ্যে রান্না-বান্না করে নিজে খেতে হয়, সবাইকে খাওয়ানোর পরে। খাবার কিছু থাকল কি না কেউই দেখেন না। নারীদের যে কোনো কিছু করতেই পুরুষের অনুমতি নিতে হয়। মনে হয়, নারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এখনও পুরুষ নির্ভর।

<sup>\*</sup> সমাজে পণ প্রথা ও নির্যাতনের বলি আজও নারীরা।

<sup>\*</sup>নারীদের সবকিছুতেই অযোগ্য হিসাবে দায়ী করা হয়। তা না হলে এমনকি বিমান দুর্ঘটনায় পাইলটকে দোষারোপ না করে নারীকে দোষারোপ করা হতো না। তবে, নারীদের নিয়ে আমাদের চিন্তা-ধারনা কেমন হওয়া উচিত তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আমাদের সব মহান ব্যক্তিদের ধ্যানধারনায়। যেমন-

"বউয়েরা ঘরের লক্ষী হয়। এঁদেরকে যত বেশি ভালোবাসা দেওয়া হয়, তত বেশি সংসারে শান্তি আসে" -হুমায়ুন আহমেদ।

"সেই পুরুষই কাপুরুষ যে স্ত্রীর কাছে প্রেমিক হতে পারেনি"-কাজী নজরুল ইসলাম।

"মন ভালো রাখতে বউকে ফেসবুক, ফোনবুক, নোটবুকসহ সবধরনের অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড দিন"-মার্ক জুকারবার্গ।

এত কিছু জানার পরও যাঁরা নারীদের যথেষ্ট সম্মান দিতে নারাজ,তাঁদের উদ্দেশে বলতে চাই, আমাদের সমাজের বিচারে এত অ যোগ্য নারীরাও কিন্তু না ঘুমিয়ে, খেয়ে না খেয়ে ১৫-২০ ঘন্টা কাজ করতে পারেন তাঁদের দুটি কোমল হাতে। সেই নারীরা এত অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরও চেহারার যত্ন নিতে পারেন নিখুঁতভাবে এবং মনের সব কষ্ট, যন্ত্রণা ও একাকিত্বের প্রকাশ করেন নীরবে নিভূতে চোখের জলে। কারণ নারীরা শান্তিকামী। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী নিজেদের সমাজের উন্নতর অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছেন তা অনেক সময় নারী সমাজকে প্রশ্নের মুখে এনে দিছে। কিন্তু তার সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য।

যাই হোক, নারী-পুরুষ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা মানব সমাজে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মেয়েদের জীবনে যেসব সমস্যা আছে তা মুলত সামাজিক কাঠামো তথা মানুষেরই সৃষ্টি। উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনে নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে উন্নত মানসিকতা অতি আবশ্যক।

# ইতিহাসের আলোকে 'মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী'

#### मृगान প্रধान

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহা<mark>স বিভাগ</mark> পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার সমাজ ও সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারতীয় সমাজে যার অন্তিত্ব সু-প্রাচীন কাল থেকে সুবিদিত। তক্ষশীলা (খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতক-পঞ্চম শতক), নালন্দা (পঞ্চম-দ্বাদশ শতক), বল্লভি (ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতক), ওদন্তপুরী (অন্তম-দ্বাদশ শতক), বিক্রমশীলা (অন্তম-দ্বাদশ শতক), জগদ্দল (একাদশ-ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত) সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে গ্রন্থাগারগুলি রাজকীয় আনুগত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আলবেরুনি (৯৭৩খ্রিঃ-১০৪৮খ্রিঃ) তৎকালিন সময়ে তক্ষশীলায় সমৃদ্ধশালী অভিলেখ্যাগার ও গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও তার অন্তিত্ব পরবর্তীকালে পাওয়া যায় নি। কিন্তু প্রাচীন বা মধ্যকালীন সময়ের গ্রন্থাগারগুলি সাধারনত পন্তিত, বৌদ্ধ ভিক্ষু, রাজ পরিবার, বাদশা বা অভিজাতদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। সে অর্থে সর্বজনীন বা সাধারন মানুষের বাবহার ও প্রয়োজনে উন্মুক্ত হয়েছিল পরবর্তীকালে। বিশ্ব ইতিহাসে পঞ্চদশ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে আধুনিক লাইব্রেরিগুলি জনসাধারনের জন্য গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে ব্রিটেন পথ প্রদর্শক। ভারতের প্রসঙ্গে বলা যায়, উপনিবেশিকতা সূত্রে উনিশ শতকে ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক পাবলিক লাইব্রেরির বা সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচনা হয়েছিল।

পাবলিক লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, জনসাধারণের প্রদেয় কর বা অর্থে নির্মিত। দ্বিতীয়ত, পাবলিক লাইব্রেরি শব্দটির বাংলা তরজমা করলে হয় সর্বজনীন গ্রন্থাগার। এই ধরণের গ্রন্থাগার জনসাধারনের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত হতে হয়। তৃতীয়ত, জনপ্রিয় ও পান্ডিত্যপূর্ণ উভয় গ্রন্থাবলীর সমাহার। চতুর্থত, একটি পরিচালক সমিতির উপস্থিতি। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে তৎকালিন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর H.V. Bayly মেদিনীপুর শহরে 'পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর নিরিখে গ্রন্থাগারটিকে বাংলার প্রথম জেলাভিত্তিক সরকারী গ্রন্থাগারের মান্যতা দেওয়া যায়।

উনিশ শতকের শুরুতে ইউরোপীয়দের সাহায্যালাভে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায় গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ভারতের প্রথম আধুনিক পাবলিক লাইব্রেরির সূচনা হয়েছিল (১৯৫৩খ্রিঃ গ্রন্থাগারটি ভারতের 'জাতীয় গ্রন্থাগার' হিসেবে ঘোষণা করা হয়), যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ক্রমে জেলাগুলির প্রধান শহরগুলিতে সরকারী ও ব্যাক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। এই উদ্যোগে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি ছিল প্রথম।

মেদিনীপুরে গ্রন্থাগারটি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। গড়ে তোলার সরকারি উদ্দেশ্য ছিল, কোম্পানির ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এদেশীয় কিছু কর্মচারী প্রশিক্ষিত করে তোলা। এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে নিযুক্ত করা। সেই সঙ্গে উনিশ শতকের তিন এর দশক থেকে ইংরেজী মাধ্যমের সরকারী ও ব্যাক্তিগত উদ্যোগে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটতে শুরু করেছিল।১৮৩৪ খিষ্টাব্দে 'কলেজিয়েট স্কুল' (১৮৩৫ থেকে সরকার অধিগ্রহন করেছিল) এবং ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর কর্তৃক 'বাংলা স্কুল' (যেটি 'বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ' নামে পরিচিত) গড়ে ওঠে। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিগ্রহণের পর মেদিনীপুর সদর জেলার প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়। ইউরোপীয় প্রশাসক এবং সামরিক কর্তা শহরে অবস্থান করতে থাকেন। সেই সঙ্গে কোম্পানি শাসনে এদেশীয় একদল অভিজাত শ্রেণী (জমিদার ও ব্যবসায়ী) গড়ে উঠেছিল। ফলস্বরুপ কোম্পানির নীতি ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের জন্য লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

Bayly কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদেশীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নাসের আলি খাঁ (Henry Ricketts এর প্রতিবেদনে Nussur Allee Khan এবং যোগেশ বসু কর্তৃক নাজারথ আলি খাঁ উল্লিখিত হয়েছে) গ্রন্থাগারটি নির্মাণে ভূমিদান করে সহযোগীতা করেন। দেশীয় জমিদারদের মধ্যে নাড়াজোলের জমিদার রাজা অযোধ্যালাল খান, শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব এবং বালাসোরের বৈকুষ্ঠনাথ দেব উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া রাজনারায়ন বসু গ্রন্থাগার নির্মাণ ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ২,৭০০ টাকা ব্যয়ে গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলা হয়। গৃহ নির্মাণে খরচ হয় প্রায় ১,৬৫৮ টাকা। W.W. Hunter এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ভবনটির একদিকে গড়ে তোলা হয়েছিল ছোট একটি বাগান এবং অন্যদিকে জলাধার।

শুরুতে গ্রন্থাগারটি পরিচালনার জন্য Bayly সভাপতি ও রাজনারায়ণ বসু সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। কিছু সময় পর একজন ইউরোপীয়ের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কার্য নির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। যার মধ্যে তিন জন হিন্দু ও তিন জন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। একজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হত, যার মাসিক বেতন ছিল ১০ টাকা।

গ্রন্থারটির গ্রাহক বা সদস্য দুভাবে হওয়া যেত, প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি। প্রথম শ্রেণির জন্য মাসিক ১ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য ৮ আনা অর্থ প্রদান করতে হত। Ricketts এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পাঠাগারটি শুধু মাত্র এদেশীরাই গ্রাহক হত তা নয়। শুরুতে গ্রাহক সংখ্যার একটা বড় অংশ ছিল ইউরোপীয়। যদিও পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষে ১৪ জন ইউরোপীয় ও ১৩ জন এদেশীয় গ্রাহক ছিল। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রাহক সংখ্যা পৌঁছায় ৪৮জন-এ, যার মধ্যে ৪ জন ইউরোপীয় এবং ৪৪ জন এদেশীয়।

গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠার কিছু সময়ের মধ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল দুস্প্রাপ্য বই ও পান্তুলিপির সমাহারের জন্য। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ১,৮৭০ এবং ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মোট বইয়ের সংখ্যা হয়েছিল ৩,১২৮। ১৮৩৯ খিষ্টাব্দে (২৯শে জুন 'সমাচার দর্পণ') কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ছিল ১,৮০০। যা থেকে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সমৃদ্ধি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। তৎকালীন Ricketts গ্রন্থাগারটি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেন "...the Midnapore Public Library, for I think it affords an example which might be followed with much advantage at all large Stations." মেদিনীপুর শহরে আসা ইউরোপীয় প্রশাসকেরা কেউ গ্রন্থাগারটিতে বই দান না করে যেতেন না, যা সমৃদ্ধির আর একটি কারণ ছিল।

Bayly কর্ত্ক প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটি প্রথমে 'Midnapore Public Library' নামে পরিচিত হয়। প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কারনে ১৯৩৮খ্রিষ্টাব্দে পাঠাগারটির নাম পরিবর্তন করে 'Bayly Hall Public Library' রাখা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষত, গুপু সমিতি ও স্বশস্ত্র ছাত্র আন্দোলন পরিচালনায় অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে এটি গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাগারটির নাম পরিবর্তন করে 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার' রাখা হয়েছে।

#### সমস্যা

### অমৃতা মাল

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

রুচিরা মুখার্জী, সরকারি অফিসের গ্রুপ সি তে চাকুরিরতা বেপরোয়া, দুরন্ত, প্রাণবন্ত, বেঁটেখাটো গড়নের মোটামুটি সুশ্রী বছর পঁচিশের তরুণী, যার বর্তমান জুড়ে শুধু সমস্যারই রাজত্ব। অবশ্য তা তার মোটেই মাথাব্যাথার কারণ নয়। বরং যেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সমস্ত দিনটিই সমস্যা ছাড়া অতিবাহিত হয়, সেদিন সে বড় একাকীত্ব অনুভব করে। বাড়ি থেকে একা দূরে থাকার জন্য নতুন নতুন সমস্যা যে তার কাছে নিছক সময় কাটানোর পন্থা তা নয়, বরং সমস্যাই তার দোসর। বড়ু অগোছালো রুচিরার কাছে পৃথিবীর সমস্ত গোছানো কাজই এক বড় ধরণের সমস্যা। তবে এমন নয় যে সে এই সব সমস্যা থেকে কিছু শিক্ষা নেয় না। প্রত্যেক নতুন সমস্যাই তাকে একটু একটু করে নতুন রুচিরাতে পরিণত করে। আসলে ছোট থেকে পরিবারের চোখের মণি হয়ে বড় হয়ে ওঠা রুচিরার কাছে বাইরের জগণ্টো বড় নিষ্ঠুর। তার শুধু মনে হয়, হাতে গোনা কয়েকজন ব্যাক্তি ছাড়া বাকিরা তাকে শুধু নানা অছিলায় সমস্যার মধ্যে ফেলতে চায়।

অফিস থেকে এসে আজ সে অন্যদিনের থেকে একটু আগেই বিছানায় গেল। কাল তাকে একটু সকাল করে উঠতে হবে। অফিসের প্রতিষ্ঠা দিবস কাল। তার ওপর তাকে আবার বক্তৃতাও দিতে হবে।

পরের দিন সকালে ঠিক অপ্রত্যাশিতভাবে দেরিতে ঘুম ভাঙল। ফলস্বরূপ নরম দু-গাল ভেজা নোনাজল ও হাতে পায়ে ঝড়ের ব্যস্ততা নিয়ে মোটামুটি তৈরি হয়ে ফাইল পত্র, টিফিন কৌটো নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা দিল। বাকি সমস্ত কাজই অন্য দিনের মতো ট্রেনে তৈরি করে সময়ে অফিস পোঁছে যায় সে। দিনের শেষে ঠোঁটের কোণে চওড়া হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে রুচিরা। সকালের ফেলে যাওয়া ঘরটা দেখে তার সেই হাসি উধাও হয়ে কপালে ভাঁজ পড়ে, সঙ্গে একরাশ মনখারাপও মুহূর্তে তাকে পেয়ে বসে। সকালের ফেলে যাওয়া ঘরটা তার কাছে এমন এক পরিত্যক্ত নোংরা জায়গা বলে মনে হয়। য়েখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা ঢাকনা বিহীন জলের বোতল, বিস্কুটের কৌটো, তাতে লাইন দিয়ে লেগে থাকা লাল পিঁপড়ের সারি দেখে তার দুই অশ্রু গ্রন্থতি নোনা জলের জোয়ায় আসার উপক্রম। ঠিক এই সময়ই তার প্রিয় পোষ্য ডায়নার প্রভু আসার আনন্দে উচ্চস্বরে ডাকাডাকিও আনন্দ প্রকাশ গোটা ঘর প্রাণের উচ্ছাসে ভরিয়ে দেয়। সমস্ত কাজকর্ম সেরে এক হাতে এক পেয়ালা গরম চা ও কোলে ডায়নাকে নিয়ে আদর করতে করতে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে রুচিরা নিজেকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা, সমস্যাবিহীনও কী জীবন হয়? যদি হয়, সেটা কী আগামী কোনো বড় সমস্যার নির্দেশক নয়? এ সব আকাশ কুসুম ভাবতে ভাবতে তার হঠাৎ এক মহৎ বাণী মনে পড়ে যায়-

"The problem is not the problem; the problem is your attitude about the problem."

#### অন্য বসন্ত

### শ্রেয়সী কুন্ডু

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

একান্নবর্তী পদমর্যাদা সমন্বিত ও বনেদিয়ানায় বড় হওয়া পরিবারের একমাত্র পুত্র সন্তান সৌমেন্দু চট্টরাজ । মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে অভূতপূর্ব ফলাফল করে, মনে এক আবছা কমিউনিজমের গন্ধ মেখে শহরের এক নামী কলেজে ভর্তি হল। সালটা ছিল ১৯৯০, এখনকার মত স্মার্ট ফোন, আনলিমিটেড ডাটা প্যাক-এর যুগ ছিল না। ছিল চিরকালীন ল্যান্ডলাইন ও কদাচিৎ BSNL-এর যুগ। অনেক বোনের একমাত্র সম্মান, ভালোবাসা, ভরসা, আদর্শের এহেন দাদার আপন বোন না থাকার অভাব তখনকার দিনে খুব একটা অনুভূত হতো না প্রত্যন্ত পরিবারগুলোতে। পরিবারের খুড়তুতো বোন শর্মী তার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট হলেও সে ছিল তার বন্ধু। ফলে সৌমেন্দুর মনের খবরাখবর সবই তার জানা। শর্মির প্রিয় বান্ধবী সমর্পিতা ছিল সৌমেন্দুর একমাত্র ভালোবাসা।

স্কুল ফাইনালে শর্মীও ভালো ফলাফল করল, আর তারপর সে ও তার প্রিয় বান্ধবী সমর্পিতা দুজনেই গ্রামের চট্টরাজদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক অংশে ভর্তি হল। শর্মীর বুদ্ধিদীপ্ত রেজাল্ট সহজেই অনেক ভালো ভালো স্কলারশিপ আর ভালো পড়াশুনার সুযোগ এনে দিলো। সমর্পিতা ছিল গরীব মুখার্জীবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা। কেরানির চাকরি থেকে অবসরের পূর্বেই কন্যাদায় মুক্ত হবার জন্য পিতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী হলেন। সমর্পিতা সুন্দরী, সাধারণ মেধার মেয়ে। কিন্তু তার মধ্যে ছিল অসাধারণ শিল্পীসত্ত্বা। যেমন আসন তৈরি, বিভিন্ন ফেলে দেওয়া জিনিস পত্র দিয়ে নানান ধরনের অসামান্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইত্যাদি তৈরি, এছাড়া এমব্রয়ডারি সেলাই ইত্যাদি।

চট্টরাজ পরিবারের শিমুল পলাশে ঘেরা স্কুল মাঠের অদূরে রাধাগোবিদ্দ মিদরের বসন্ত উৎসবে গোটা গ্রাম তথা জমিদার মহল্লার সকলেই সমবেত হতেন। তিনদিন ব্যাপী এই বিখ্যাত উৎসব চলে আসছে। নদীর ধারে এই পলাশবনির মাঠে এক নিভৃত শিমুল গাছের তলাটি সৌমেন্দু সমর্পিতার প্রেমের সাক্ষী ছিল। গল্পের ছলে বাস্তববাদী সমর্পিতা একদিন সৌমেন্দুকে বলে শিমুলের রঙ কত রাঙা, অথচ বৃক্ষ ভর্তি কন্টক - প্রেমের মত। তখন সৌমেন্দু একমুঠো লাল আবিরের রং-এ রাঙিয়ে দিয়ে তাকে বলে, প্রেম তো বর্ণময়ই, তবে কন্টক তার আঘাতে প্রেমকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। সেই বসন্তই ছিল তাদের প্রেমের শেষ বসন্ত। উচ্চমাধ্যমিক শেষ করার পর বৈশাখের এক লগ্নে বিয়ে হয় সমর্পিতার বাবার সম্বন্ধ করা পাত্রের সাথে। সেই বছরই সৌমেন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যায়। তারপর আর কোনদিন তার গ্রাম পরিবার-পরিজন কেউই গ্রামে টেনে আনতে পারেনি তাকে। একের পর এক ডিগ্রি, উচ্চস্থান, উচ্চশিক্ষা, মর্যাদা লাভ করতে করতে কখন তার জীবনেও পঁচিশটা বসন্ত পার হয়ে যায় সময়ের স্রোতে।

এদিকে শর্মী দাদাভাইকে অনেক বার ফিরতে বললেও সে আর কোনদিন ফিরতে চায়নি, আর তার কোন কথাই যেন শুনতে চাইত না। এদিকে শর্মী উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে গ্রামের বিদ্যালয়ে যুক্ত হয়, আর বাড়ির সকলের মধ্যমণি ও বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল হয়ে ওঠে।

এদিকে সমর্পিতার জীবনে বিয়ে ছিল একটা অভিশাপ। শৃশুরবাড়িতে পণের টাকার জন্য প্রতিদিন অশান্তি, গঞ্জনা, তার ওপর কন্যা সন্তানের জন্মদান - তার জীবনে সেই ঘর আর সম্পর্কগুলো হয়ে উঠল জ্বলন্ত চিতা। পিতা-মাতাহীন এরকম নারীরা সবার জন্যই সে সময় ছিল গলগ্রহ। এই অবস্থা সে কোনরকমে মানিয়ে চলছিল কিন্তু হঠাৎ মদ্যপ অবস্থায় স্বামী মারা যায় বাইক দুর্ঘটনায়। শৃশুরবাড়িতে তার আর জায়গা জুটলো না, তাই সে তার কন্যা সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি আসতে বাধ্য হলো। কিন্তু সেখানেও তার দাদা বৌদিরা দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল তাকে। তখন ওই মন্দিরে মেয়েকে রেখে একটিবার শিমূলতলায় ঘুরে এসে নদীতে ভরা বর্ষায় আত্মহননের সুযোগে যেন স্বর্গ পেল সে। হঠাৎ প্রাতঃভ্রমণ সেরে শর্মি মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে শিশুর কান্নার আওয়াজ ও সমর্পিতার আত্মহত্যার চেষ্টা দেখে। নিজে সমস্ত বিষয়টি কোনমতে সামাল দিয়ে অনেক বুঝিয়ে বন্ধুত্বের দিব্যি দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে সমর্পিতাকে।

সমর্পিতার সেলাই ও এমব্রয়ডারির কাজের জন্য handicraft training ও স্থানির্ভর দল গঠন হয়, বিদ্যালয়ের এক প্রান্তে উক্ত বিষয়ের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত ও ভোকেসনাল ডিপার্টমেন্ট খোলে। সমর্পিতা ও তার কন্যার জীবন সমাজের রক্তচক্ষু, হীনদৃষ্টি এবং লোলুপতা থেকে রক্ষা পায়। শর্মী অনেকবার চেষ্টা করেছে দাদাভাইকে সমর্পিতার বিষয়ে সব কিছু জানাতে। কিন্তু দাদাভাই বংশমর্যাদা, মেকি সম্মানবোধ, অহংকার ও ভুল বুঝাবুঝির বোঝায় সব সত্য ও বাস্তব থেকে সযত্নে নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছে সব সময়।

শর্মী দিদি হিসেবে সব বোনেদের শিক্ষাদিক্ষা সম্পূর্ণ করে তাদের প্রতিষ্ঠিত ও পাত্রস্থ করে সব কাজ সেরে যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার সাথে গ্রামের মেয়েদেরকে স্বনির্ভরতার পথে অগ্রণী হতে সাহায্য করা এবং ছাত্র ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা সবকিছুই তাকে ভরিয়ে রেখেছিল। সমর্পিতার কন্যা সৌমিতা ছিল তাদের দুজনের জীবনের এক অদ্বিতীয় সাহারা।

হঠাৎ একদিন ডিসেম্বরের সকালে বিদেশ থেকে ফোন আসে দাদাভাইয়ের। সে বিদেশে থেকে ক্লান্ত , গ্রামে ফিরতে চায়। শহরের নামী কলেজে অধ্যাপনা করেই বাকি জীবন কাটাতে চায়। শর্মী আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

প্রতি বছর বিদ্যালয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান সুন্দর ও বর্ণময় করে তোলে সমর্পিতা তার অসাধারণ শিল্পীসত্ত্বা দিয়ে এবং তার সঞ্চালন ভূমিকা থাকে উল্লেখযোগ্য। আগামী মার্চে বসন্ত উৎসবের দিন তার বিদ্যালয়ের ১২৫ বছর পূর্তি। অনুষ্ঠানের কয়েক মাস আগে সমর্পিতার অসহ্য পেটের যন্ত্রণা এবং রক্তবমির মাধ্যমে তার জীবনে ক্যান্সারের উপস্থিতি শর্মী ও সমর্পিতাকে খুব আহত করে। কেমো নিয়ে নতুন করে এই বসন্ত উৎসবে যে সমর্পিতাকে সামিল হতেই হবে!

সেই ১২৫ বছর পূর্তিতে শহরের সব নামিদামি ব্যক্তিত্ব, পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীর নিমন্ত্রণ আর বিশেষ অতিথি হয়ে সৌমেন্দু চট্টরাজ গ্রামে আসে ২৫ বছর পর। বসন্ত উৎসবের সকালে সেই শিমূল তলায় গিয়ে সে দেখে, কেউ তার আগেই নীল-গোলাপী- বাসন্তী আবিরে রাধা গোবিন্দের প্রতী কীর মাধ্যমে তার সমর্পিতার আঁকা আলপনার পট এঁকে গেছে।

গ্রামের বিদ্যালয়ের ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের মহাসমারোহে তার মনে পড়ে ২৫ বছর আগের প্রিয়তমার মুখ, যেন প্রদীপ হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। বাসন্তী সাজ ,খোঁপায় পলাশ আর কপালে আবির। সে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনা। অনুষ্ঠানের সূচনা করেই বোনকে টেনে নিয়ে যায় শিমূল গাছের তলায়। জানতে চা য়, তার না শোনা অসমাপ্ত কথাগুলো। শর্মী বলে, "থাক, আজ আর ২৫ বছর পর ওই গল্প শুনে কি হবে? ওই যে মেয়েটি, সমর্পিতার কন্যা সৌমিতা, যার শরীরে বইছে এই চট্টরাজবংশের রক্ত,আর ওই শিমূলতলায় সমর্পিতার চিতা ভস্ম চিরনিদ্রায় নিমগ্ন"।

কথাগুলো শুনে আত্মগ্লানিতে, অপরাধবোধে কুঁকড়ে পড়ে সৌমেন্দু। তারপর ভৎসনার সুরে শর্মী বলে,"না! আমার ভুল ছিল যে, আমার দাদাভাই বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিদের মহত্ব বহন করে, রামমোহনের মতো নারী শিক্ষা ও প্রগতির প্রতীক। তা নয় সেটা ২৫ বছরে সেই ভুল ধুয়ে মুছে গেছে। তুই তো সেই যুগেও ছিলি, বিদ্যাসাগরের বিরোধীদের দলে, রামমোহনের পরিবার-পরিজনদের মত মিথ্যা বংশমর্যাদালোভী সম্মানীয় মানীদের দলে। তোর কাছে কমিউনিজম শুধু লেনিনের বই, তোর বক্তৃতা, আর তোর বড় পদে অবস্থান এবং তার উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ রে। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির মধ্যমেধার সামান্য নারী সমর্পিতা, সৌমিতারা আজ এই কমিউনিজম, বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের ব্যক্তিত্বের প্রতীক বাস্তবিকই, তাদের খোঁজ কেউ রাখে না, তাদের কোনো পরিচিতি,বংশ মর্যাদা,সম্মানের ভয় নেই,তবু তারা আজ জয়ী। জীবনের ওপারে গিয়ে যেমন সমর্পিতা আজ জয়ী, ঠিক তেমনি!"

এই ভর্ৎসনা আর তার আসল সৌমেন্দু সত্ত্বা সমর্পিতা কে হারিয়ে সর্বহারা হয়েও তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার "পিতৃত্বের স্বাদ" পায় সৌমিতার মাধ্যমে। সেই অপরাধের ক্ষমা স্বরূপ সৌমিতার কাছে পিতৃত্বের অধিকার সর্বসমক্ষে ভিক্ষা করে সৌমেন্দু। সৌমিতা, সমস্ত অন্যায় অবিচারের উর্ধেব গিয়ে সমর্পিতার সমর্পণের প্রতিমূর্তি হয়ে পিতৃপরিচয় সসম্মানে স্বীকার করে এক সাধারনকে অসাধারনত্বে উন্নীত করেছিল তার শিক্ষা সংস্কার ও বিচারের নিরিখে, এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজে।

# করোনাময় বিশ্ব--- এক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষিত

#### শোভন ঘোষ

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

প্রত্যেক সৃষ্টিরই পশ্চাতে রয়েছে একটা প্রেক্ষাপট। আমরা যদি কোন কিছু গভীরভাবে ভেবে দেখি, তাহলে বুঝবো - প্রত্যেক সৃষ্টির আছে একটা রহস্য, রয়েছে একটা ইতিহাস। এই ব্যাপারটা শুধু সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এই মহাবিশ্বের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংযোগ-সাধন করে চলেছে মানুষ। মানবিশ্ব এবং বিশ্বপ্রকৃতি মন্তনের ফলে যা কিছু উঠে আসছে, তাই হৃদয়বৃত্তির সংযোগে এবং মন ও বুদ্ধির স্পর্শে রূপলাভ করেছে নানান সৃষ্টিকর্মে- শিল্পকলায়। একই ঘটনাকে অবলম্বন করে কেউ সাহিত্য রচনা করেছেন, কেউ চিত্র অঙ্কন করেছেন, কেউ সংগীত রচনা করেছেন, তো কেউ চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন, কেউ বা আবার তাকেই বিজ্ঞান সাধনায় অঙ্গীভূত করছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি গাছ দেখে কেউ চিত্র রচনা করলেন, কেউ কবির ভাষায় রূপ দিলেন, আবার কেউ ভাবলেন সত্যিই তো গাছের প্রাণ আছে কিনা! এই দেখার ভিন্নতায় মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি ও শিল্পকর্মের প্রেরণা যোগাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে অনেক ব্যর্থতা, অনেক দুঃখ-বেদনা মানুষকে সৃষ্টি অভিমুখী করেছে। নিরন্তর অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর সন্ধানে ব্রতী হয়েছে মানুষ। অবশ্য মানুষের আনন্দ বা প্রাণপ্রাচুর্যও সৃষ্টিক্ষেত্রের একটা দিক; বলাবাহুল্য সেই ক্ষেত্র আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়।

চোখের সামনে ঘটে যাওয়া অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনা থেকে, বহুদিন ধরেই মুক্তি চেয়েছে মানুষ। তার সেই বেদনামুক্তির পথ'ই তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে নানা সৃজনশীলতায়। যেমন মানুষের বিভিন্ন রোগব্যাধি প্রভৃতির ফলে অকাল-মরন রোধের ভাবনা, শারীরিকভাবে সুস্থ-সুন্দর থাকার চেষ্টা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছে। প্রকৃতির রোষানল থেকে মুক্তির চিন্তা,বিশ্বের নানা রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস, অজানাকে জানবার-অদেখাকে দেখবার দুর্দম বাসনা ইত্যাদি মানুষকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির সাধনাতে নিযুক্ত করেছে। আর সর্বদেশ ও সর্বকালের মানুষকে, মানুষের মতো করে কাছে পেতে, তার দুঃখ-বেদনাকে চিরকালীন করে তুলে এক অপার্থিব লোকে পৌঁছে দিতে, অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে শিল্প-সাহিত্য ললিতকলা।

সৃজনশীলতার ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, স্রষ্টার হৃদয়ে এক উদ্বেলতরঙ্গমালার অভিঘাত থেকে সৃষ্টির জন্ম। এই অভিঘাত যত ব্যাপক এবং আঘাত যত গভীর,
সৃষ্টি ঠিক ততখানিই উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ; অবশ্য তার সাথে প্রতিভার সম্মিলন ঘটে থাকে।
বর্তমান এই করোনাময় বিশ্ব আজকে, মহাসমুদ্রের মতো উদ্বেল তরঙ্গমালা নিয়ে অপেক্ষমান।
স্রষ্টার কাজ হবে তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করে, তিনি কোন এক মুক্তির দিশা দেখাবেন কিংবা
তাঁর কালকে সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে গ্রথিত করবেন চিরকালের সঙ্গে। স্রষ্টার মৃত্যু আছে, সৃষ্টির
মৃত্যু নেই।বর্তমান এই পরিস্থিতি শুধু সাহিত্যই নয়, জন্ম দিতে পারে এমন অনেক নতুন
দর্শন, নতুন ইতিহাস, নতুন বিজ্ঞান সহ আরো অনেক কিছুর।

কয়েকটা ঘটনার কথা বলি -

আমি গতবার আমেরিকাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে বেশ কিছু মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার। তাদের মধ্যে থিয়েট্রা'র কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। থিয়েট্রা এক রেস্তোরাঁর খাবার পরিবেশক। আমি যে কদিন ওখানে ছিলাম, ওই রেস্তোরাঁতেই খেয়েছিলাম। থিয়েট্রা যখন খাবার পরিবেশন করত, কি দারুণ অভিভাবকত্ব ছিল তার মধ্যে; ছিল কি গভীর অনুরাগ। এই দেনা-পাওনার পৃথিবী তার মূল্য বুঝবে না কখনো। আমি তাদের সমস্ত টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তার সেই গভীর ভালোবাসার ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারিনি, পারব না কখনো। সুদূর প্রবাসের এই বিদেশিনীর জন্য আমার মন আজও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই করোনাময় পরিস্থিতিতে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, কেমন আছে ওই পিতৃ-মাতৃহারা বিদেশিনী থিয়েট্রা।

সেবার আমরা কয়েকজন রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে পথ হারিয়ে ফেলেছি। ভাবছি কোন দিকে যাবো, হঠাৎ দেখা হলো নাতাশার সঙ্গে। ভ্রাম্যমাণ জীবন নাতাশার। নাতাশার সঙ্গে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে এবং তার অসুস্থ স্বামী। আমরা একটা পথ ঠিক করে ফেলেছি যাব বলে, কিন্তু নাতাশাকে জিজেস করাতে, ও বলল ওদিকে যাবেন না বাবু, ওদিকে প্রকাণ্ড সব বিষধর সাপ আছে। আপনারা বরং আমাদের সাথে চলুন; <mark>আমরাই পথ দেখিয়ে দেব। ওদের কথা বলার মধ্যেই হঠাৎ, নাতাশার ছোট মেয়েটা আমার</mark> দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু চাইছে; আমি কি দেবো কি দেবো ভাবছি। হঠাৎ আমার এক বন্ধু আমাদের স্যত্নে রক্ষিত খাবারের একটা প্যাকেট দিয়ে দিল, আমিও তার সঙ্গে একটা কোপেক (রাশিয়ান মুদ্রা) যোজনা করলাম। কৃতজ্ঞতায়, প্রাপ্তিতে ওদের দুচোখ ভরে উঠলো। কে জানে সেদিন নাতাশার সঙ্গে দেখা না হলে, ও পথে পা বাড়িয়ে সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটত কিনা! পৃথিবীতে মানুষের এমন অনেক অবদান থাকে, যার ঋণ সারাজীবনই অপরিশোধ্য। খুব সৃক্ষ অনুভূতি ছাড়া বোঝা যায় না সে সব ব্যাপার। কোপেক প্রাপ্তির পরক্ষণেই, নাতাশার গর্বোজ্বল মুখটা আমার বেশ মনে পড়ছে। ওই দিয়ে হয়তো ওর কিছুটা ক্ষণ হলেও সংসার আনন্দে ভরে উঠবে। দয়া-মায়া,স্নেহ-মমতায় পূর্ণ মায়ের সংসারে, এই অনেক। এখন নাতাশা আর তার পরিবার কেমন আছে জানিনা। কেমন আছেন তার সেই অসুস্থ স্বামী! রাশিয়ান গভর্মেন্ট কি যাযাবরদের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে?কোন খবর নেই আমার কাছে। নাকি করোনার থাবাতে হারিয়ে গেছে কেউ নাতাশার সংসারে! কেমনই বা আছে সেই রাশিয়ান ভিক্ষকিনী।

বছর কয়েক আগে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম ইতালি। ইতালি থেকে ফিরব, চলে আসার দিন দুয়েক আগে আমি একটু বেরিয়েছি, যদি চারপাশটা আর একটু দেখে নেয়া যায়। আমি যেখানে থাকতাম, তার ঠিক পাশেই, একটা ফুটবল গ্রাউন্ড ছিল। হাঁটতে হাঁটতে মাঠটার একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক সেই সময়ই, একটা ছেলে গোল দিয়ে বসলো। দারুন গোল একেবারে। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। তারপর জোরের সঙ্গে 'হাই' বলে ছেলেটার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। আমি শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলাম। খেলার শেষে ছেলেটা আমার কাছে এল, আলাপ পরিচয় হল। শেষ পর্যন্ত সেটা দাঁড়াল গিয়ে বন্ধুত্বে। ছেলেটার নাম লুইস। আমিও ফিরে চলে এসেছি, তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, কিন্তু লুইসের সাথে আমার বন্ধুত্ব রয়েছে অটুট। আর বন্ধুত্ব হওয়ার সুবাদে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। কয়েক বছরে ওদের বাড়ির অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছিল

আমার। মাস দুয়েক পূর্বে খবর পেলাম, করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে লুইস। মনে পড়লো পূর্বেকার সেই দৃশ্যের কথা, এক তরুণবয়স্ক যুবার প্রাণোচ্ছলতা। লুইসের মৃত্যু সংবাদ শোনবার পর আমি কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছি।এখনো যে আমি নিজে বেঁচে আছি, এটাই সবচেয়ে বড় বিস্মায়ের। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, শতকোটি প্রণাম। এরপর আর কাকে ফোনকরব আমি? কী বলে সান্ত্বনা দেব লুইসের পরিবারকে!

এখন আমি যেখানে থাকি, সেটা ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এক আধা-শহর। আমাদের বাড়ির পাশেই, আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু স্বপনের বাড়ি। স্বপন কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে। আমিও এখন আর বাড়িতে থাকি না, কর্মসূত্রে অন্যত্র থাকি। এই কিছুদিন আগে বাড়িতে গিয়েছিলাম, খবর পেলাম অনেকদিন থেকেই স্থপনের আর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কেউ বলছে এই কিছুদিন আগে ট্রেনে কাটা পড়ে যে অনেক 'শ্রমিক'এর মৃত্যু হয়েছে,তার মধ্যে নাকি স্বপনও ছিল। স্বপনের বৌকেও জানানো হয়নি একথা। ছোট ছোট দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করছে। সেই <mark>ছেলেবেলাতেই কবে হা</mark>রিয়ে গেছেন স্বপনের বাবা, হারান-কাকু। বেচারা স্বপন তখনই পড়াশোনা ছেড়ে, সংসারের দায়িত্ব সামলাতে কাজে ঢুকে পড়ে। এখন স্বপনের সংসার বুড়ি <mark>'মা' আর তার বউ এবং দু'টো ছেলে-মে</mark>য়ে নিয়ে খুব কষ্টের সংসার। আমি বাড়ি যেতেই স্বপনের বউ আমার কাছে এসেছিল, আমি লেখাপড়া জানা লোক, যদি স্বপনকে খুঁজে বের করতে পারি। কিন্তু স্বপনের বৌকে কি করে যে বোঝাই, স্বপন সমস্ত স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে। অন্যান্যদের মত আমিও, স্বপনের মৃত্যু সংবাদ তার পরিবারকে দিতে পারিনি। আশায় বুক বেঁধেছে সবাই, আবার ফিরে আসবে স্বপন, - " বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না "। আমি সামান্য কয়েকটা টাকা ছাড়া, আর কোন সাহায্য করতে পারিনি স্বপনের পরিবারকে। ছেলেবেলার স্মৃতিগুলো এখনো আমার চারপাশে, কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবছি, প্রত্যেক মুহূর্তে ঝরে যাচ্ছে এমন কত জীবন। আকাশের খসে পড়া তারার মত, হঠাৎ আলোর ঝলকানি মেরে হারিয়ে যাচ্ছে তারা; অতল রহস্যের গভীর অন্ধকারে। এপারের সঙ্গে ওপারের আর কোন যোগ নেই। কাকে বোঝাব আমার জীবনের এই যন্ত্রণার কথা কি ভাষায় প্রকাশ করব আমি তাকে!

আমার বর্তমান বাসা বাড়ির পাশেই চৌরাস্তার মোড়। এই দিনকয়েক আগে রাস্তার মোড়ে,আমি একদিন একটা চায়ের দোকানে চা খাচ্ছি। একটা মেয়ে পাশের দোকান থেকে কিছু একটা জিনিস কিনছিল। মেয়েটার বয়স কুড়ি-বাইশ হবে। হঠাৎ একটা ষন্তামার্কা লোক এসে মেয়েটাকে ইশারা করল। মেয়েটা গিয়ে, কিছুটা দূরে মেয়েটা লোকটার সাথে কথাবার্তা বলছে। শোনা যাচ্ছে না ঠিকই, তবে বেশ বুঝতে পারছি, লোকটার কথাবার্তায় মেয়েটার মুখ ক্রমশ পাংশুবর্ণ হয়ে যাচ্ছে; আর কেমন যেন ভয় পেয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। চা দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, -কে বলুন তো লোকটা ? চা দোকানি যা বলল তার সারমর্ম এই - লোকটার নাম কলকা, সুদের কারবার করে থাকে। মেয়েটার বাবা এই কিছুদিন আগে, করোনা-আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। চিকিৎসার জন্য মেয়েটার পরিবার কলকার কাছ থেকে, সুদে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। আশা ছিল পিতা সুস্থ হয়ে ফিরে এলেই, কিছুদিনের মধ্যে টাকা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু বর্তমান এই সংকটকালে পরিবারটি একেবারে

ধনে-প্রাণে মারা পড়েছে। দোকানিকে আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না। কলকা চলে গেলে দোকানি বলতে থাকলেন, - কলকা এক নাম্বারের চরিত্রহীন বদমাইশ লোক। আমাকে বললেন, দেখলেন না রোশনিকে কেমন সব অঙ্গভঙ্গি করে কি সব বোঝাল। রোশনি মেয়েটির নাম। হয়তো কলকা টাকা চাইছে, নয়তো টাকার বিনিময়ে চাইছে অন্যকিছু। মনে পড়ল ইতিহাসে পড়া সেই প্রাচীন সভ্যতায়, বিনিময় প্রথার কথা। আজও এর বিরাম নেই, যুগ-যুগান্তর ধরে চলতে থাকবে। অন্যকিছু শব্দটাতে মাথা ঘুরে গেল আমার, পায়ের তলা থেকে ক্রমশ মাটি সরে যাচছে। যতটুকু দেখা যায়, দেখলাম, তার বাড়ির পথে গাঢ় অন্ধকার রাস্তায়; রোশনি ক্রমশ মিলিয়ে যাচছে। ওগো ভগবান, অন্ধকারে এইভাবেও হারিয়ে যায় আলো?

এমন শত-সহস্র ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, যা প্রত্যেক মুহূর্তে এই वित्य घर्ট চলেছে। किन्छ शब्न वना আমার উদ্দেশ্য नय़। शब्न लिখाর, शब्न वानातात वा সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপটকেই তুলে ধরতে চাইছি আমি। উপরোক্ত ঘটনাগুলো থেকে একথা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, এমনভাবে প্রত্যহ ভেঙে যাচ্ছে কত জীবন। কুঁড়িতেই ঝরে যাচ্ছে <mark>কত কুসুম,তারার মতো খসে পড়ছে কত আলো; তার ইয়ত্তা নাই। আমাদের চোখের</mark> সামনেই ঘটে যাচ্ছে এসব। বর্তমান করোনা-আক্রান্ত বিশ্বে তা আরও ব্যাপক ও জটিলতর রূপ ধারণ করেছে। চারিদিকে একটু কান পেতে শুনলেই, মরণের পদধ্বনি শোনা যায়। একটু চোখ মেলে দেখলে দেখা যায়, কি গভীর অসহায়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে মানুষ।পৃথিবীটা যেন একটা অজানা আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে। এর শেষ পরিণাম কি, কেউ জানে না। সমগ্র মানবজাতির এই দুঃসহ পরিস্থিতি যে সাহিত্য রচনার মরসুম, এ কথা কখনো বলছি না আমি। আমি বলতে চাইছি সৃজনশীল মানুষেরা তাদের রচনায়, এই সময়-কালকে এমন রূপ দেবেন, যা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে। গভীর অন্ধকারের মাঝেও দেখতে পায় আলোর রেখা। একজন বিজ্ঞানী এই পরিস্থিতিতে ভাববেন সৃষ্টির এমন এক ক্ষেত্র, যা মানুষকে এই দুর্দশার থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। একজন ঐতিহাসিক রচনা করবেন এমন ইতিহাস, যা মানবজাতির ভবিষ্যতকে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন করে তুলবে। একজন সাহিত্যিক বা শিল্পী সৃষ্টি করবেন এমন এক কালজয়ী শিল্পকর্ম, যা মানুষকে প্রাণের দিশা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। হাজারও অন্ধকারের মধ্যে, গভীর দুর্যোগে ভেঙে না পড়ে, বুক চিতিয়ে লড়তে শেখাবে। শোষণ-শাসন, লাঞ্ছনা-নিপীড়ন, অসহায়তা এসব থেকে মুক্তিই তো শিক্ষার সারকথা। সর্বোপরি এক সার্বিক আনন্দোজ্জ্বল বিশ্ব গঠনের সহায়ক হবে এই শিক্ষা। শিক্ষার লক্ষ্য তাই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমার শিক্ষা শুধু আমি, আর আমার পরিবারকে আলোকিত করতে পেরেছে; বৃহত্তর <mark>জীবনের সঙ্গে আর কোন</mark> যোগ নেই তার। আমি মনে করি এমন শিক্ষার কোন মূল্য নেই। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষের ব্যথা-বেদনাকে উপলব্ধি করতে শেখায় না, মানুষের অসহায়তায় মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রেরণা দেয় না, তা আর যায় কিছু হোক, আমার কাছে তা মূল্যহীন। বর্তমান এই প্রেক্ষাপটে আমাদের অনেক বেশি সংবেদনশীল হতে হবে। মানুষের দুঃখ-বেদনাকে, নিজের মনে করে উপলব্ধি করতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় বা প্রতিভা থেকে থাকে তাহলে এমন কিছু করতে হবে, যেখানে শত অন্ধকারের মধ্যেও অসহায় মানুষ আলোর শিখা দেখতে পান। সেই তো শিক্ষাজীবনের সাধনা।

আমরা যারা মানুষকে সাহায্য করতে গিয়ে, নানান বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি; তারা জানি কিছু মানুষ অকৃতজ্ঞ, কৃত্য়। কিন্তু শুধু তাদের জন্যই নিজের জীবনের এই মহৎ কর্মপ্রচেষ্টাকে থামিয়ে দিলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে নিজের লক্ষ্যে। লক্ষ্য যত বৃহৎ,তার পথ তত দুর্গম। মানুষের জীবন অনেক বড়ো। সেখানে অনভিজ্ঞতা, সংকীর্ণতা,অজ্ঞতা হেতু, কে কি বলল, কে কি করল তাতে কিছু যায় আসে না। নিজের উদ্দেশ্য সৎ ও পবিত্র হলেই চলবে। আমি পূর্বেই বলেছি, হৃদয়ে তরঙ্গাভিঘাত যত গভীর ও বৃহৎ, সৃষ্টি তত কালজয়ী ও শ্রেষ্ঠ। বর্তমান মানবজীবন ও সভ্যতার মহাসাগের করোনার এই ঘূর্ণাবর্তে উত্তাল হয়ে উঠেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাইরের এই অভিঘাত যে সংবেদনশীল হৃদয়ে আলোড়ন তুলবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জীবনসাধনার সর্বক্ষেত্রের প্রতিভাবানদের পথ চেয়ে থাকব আমরা, তাঁদের সৃষ্টির অপেক্ষায়।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এই ভারতবর্ষের বাইরে কখনো কোথাও যাইনি আমি, আসলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি আমার। তাই উপরোক্ত ঘটনাগুলো কাল্পনিক, কোনটাই আমার চোখে দেখা সত্য ঘটনা নয়। এগুলো সত্য ঘটনা নয় ঠিকই, কিন্তু এগুলোকে মিথ্যাও কি বলা চলে ? ভাল থাকুন সবাই, সুস্থ থাকুন। পরমেশ্বরের কাছে এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

### নদীর কান্না

#### শঙ্কর দাস

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

এখনও মাঝে মাঝে, খুব সকালে আমি কংসাবতীর তীরে যাই, আমার গবেষণা-কার্যের তরে গিয়ে দেখি শঙ্করের মতো ধ্যানমগ্ন জগৎ, नमीत शातावाता। <mark>বসেছে ধবল বক বৃদ্ধের মতো, মাছরাঙা ওঁৎ পেতে আছে।</mark> নিঃশব্দে যাচ্ছে উড়ে কত পাখি, নীলাকাশ মাঝে। এসেছে গরীব জেলে, জাল লয়ে হাতে। দুরে, রক্তশোষকের মতো -বালিচোর হচ্ছে প্রস্তুত, তুলবে বালি নদীবক্ষ হতে। দুরে কি জানি কি সাপ, কাটছে সাঁতার; ব্যাঙগুলো চুপ করে আছে। উড়্ছে ফড়িং ঘাসে ঘাসে, সোনালী ডানা মেলে তার। তখনো ভাঙেনি ঘুম কারো, শিশু রবি এসেছে আকাশে। পড়েছে অরুণ আলো স্থির জলে তার, যেন বৃদ্ধার মুখে --পড়েছে শীতের সোনালী রোদখানি। নীরব-কান্নার অশ্রুজল, ঘাসে-চারিপাশে পড়ে আছে শিশিরের মতো। যেন কতদিন আগে এই বুড়ি নদী, হারায়েছে যৌবন তার। নদীর তীরে বৃক্ষেরা সব, এখনকার সন্ততির মতো হয়ে আছে চুপ!

# বর্ষা

### সোমা সীট

বাংলা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

চারিদিকে শোনা যায় মেঘের গর্জন,
ঘন ঘন হয় বারির বর্ষণ।
তরুণ কবি সোনার রবি, মাতে রে করুণ ছন্দে,
খেলায় খেলায় মত্ত হয়ে, ফিঙে নাচে আনন্দে।
দেখা যায় ভেসে আছে কলার ভেলা;
কচি কচি ধান গাছ, মাথা নেড়ে দেয় দোলা।
মাছেরা সব অগাধ জলে আপন মনে খেলে,
এই দেখে সব মাছ ধরতে, জলেতে ছিপ ফেলে।
চারধার জলে ভরা, কেহ নাহি হয় পার;
মানুষ মরিছে যত, করে হাহাকার।
জলে ভেসে যায় সব কেহ নাহি পাশে,
ঘরবাড়ি জিনিসপত্র সব পদ্মের ন্যায় ভাসে।



### সময়ে - অসময়ে

সুমন বেরা

প্রাক্তনী , দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) (শিক্ষাবর্ষ : ২০১১ – ২০১৪)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়
এম. এ. (রৌপ্য পদক), নেট এবং সেট কোয়ালিফায়েড

চলার পথে হাতে তুলে নিলাম ছোট দু'টি পাথর। কচি দু'হাত ভরে গেল, ভরে গেল হাতে অতীত। কোন শৈশবের অতীত, কোন প্রারম্ভিক বাল্যকালের অতীত, অতীত শত বছরের। গাছ থেকে ফল পাড়া আর-আদান-প্রদান হয়ে গেল কত স্মৃতি।

রকমারি সময়ের কথা,
শিশুহাতে ঘুরে বেড়ায় কত আনন্দ হয়ে।
পথে যেতে যেতে ফেলে দিলাম তাদের,
অদৃশ্য সময়ের সাথে চলে গেল তারা,
চলে গেল তিনকাল পেরিয়ে।
পথে আমি এগিয়ে যাই,
আমি নক্ষত্রের আলোয় নীরবে ছুটে যাই,
কয়েক শতান্দী পেরিয়ে,
সময়ে –অসময়ে।

### বিজয়ী বনাম বিজিত

### মির্জা মোজাম্মিল

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাণিজ্য বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

বিজয়ী: সর্বদা সমাধানের একটি অংশ।

বিজিত: সর্বদা সমস্যার একটি অংশ।

বিজয়ী: সর্বদা একটি কার্যক্রম থাকে।

বিজিত: সর্বদা একটি অজুহাত থাকে।

বিজয়ী: বলেন আপনার জন্য এটি করতে দিন।

বিজিত: বলেন এটি আমার কাজ নয়।

বিজয়ী: প্রতি সমস্যার সমাধান দেখতে পান।

বিজিত: প্রতি সমাধানে সমস্যা দেখতে পান।

বিজয়ী: বলেন কাজটি কষ্টকর, কিন্তু হতে পারে।

বিজিত: বলেন হয়ত হতে পারে, কিন্তু খুব কষ্টকর।

विजय़ी: जुल कत्रल जुल श्रीकात करतन।

বিজিত: ভুল স্বীকার না করে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেন।

विজয़ी: এদের স্বপ্ন থাকে জীবনে।

विकिंण: এদের নাম মাত্র পরিকল্পনা থাকে জীবনে।

বিজয়ী: দেখেন লাভ।

বিজিত: এরা এরা দেখেন ব্যথা বা কষ্ট ।

বিজয়ী: এরা দেখেন দায়বদ্ধতা ।

বিজিত: এরা দেখেন সমস্যা ।

বিজয়ী: এরা ভাবেন ভবিষ্যৎ নিয়ে।

বিজিত: এরা ভাবেন অতীত নিয়ে।

বিজয়ী: এরা কঠিন যুকতিতে সহজ শব্দ ব্যবহার করেন ।

বিজিত: এরা সহজ যুক্তিতে কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন।

জীবনে আমাদের প্রত্যেককেই হতে হবে বিজয়ী। না হলে দুঃখে কষ্টে জীবন হবে বিজিত।

# মাগো এবার তুমি জাগো

### সোমনাথ ভট্টাচার্য

চতুর্থ সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ (স্নাতক, সান্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মিথ্যা বল, মিথ্যা বল, বাসবে তোমায় সবাই ভালো । সত্য কথা বললে পরে দিতে হবে মাসুল । আর কতদিন শোভার তরে রাখবে হাতে ত্রিশূল ! || মাগো, এবার তুমি জাগো || ১

গরিব যারা, মরেছে তারা ফুটপাতে অনাহারে! বাবুরা যদি এক আনা খায়, বাকি সব নষ্ট করে। ওদের জন্য এক মুঠো চাল রাখো না কেন শিখায় তুলে, অন্নপূর্ণা নাম যে তোমার সে কথা কি গেছে ভুলে? ॥ মাগো এবার তুমি জাগো ॥ ২

কলির করাল গ্রাসে, লাজুক বধু সাহেবি ড্রেসে পুলিস ফাইল তাই ভরেছে নাকি শ্লীলতাহানি কেসে! আর কতদিন দেখব এসব, কবে হবে ইতি! কাদের ভয়ে নিরব আছো বলো ভগবতী! || মাগো এবার তুমি জাগো || ৩

গদির জন্য দেশের নেতা ধর্মে দিয়েছে জোর!
ধর্ম নিয়ে চলছে দাঙ্গা, রক্তে মাখানো ভোর।
রক্তের জোরে হল্লা করে কেড়েছে স্বাধীনতা,
"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"
কেবলই কি মিছে কথা।
|| মাগো এবার তুমি জাগো ||
|| মাগো এবার তুমি জাগো || 8



# তুমি আসবে বলে (২০২০)

# বিশ্বজিৎ আদক

দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতকোত্তর) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

৩১'সে ডিসেম্বর, ২০১৯...
রাতে কত আয়োজন, কত লোক, শুধু তুমি আসবে বলে।
কত আলো, কত হইহুল্লোড়, শুধু তুমি আসবে বলে।
জানো, সেবার যখন তুমি আসবে জানালে, আমাদের ছোটো মন্টু,
টিফিনের টাকা জমিয়ে বাতি কিনেছিল।
আর ও পাড়ার গুবলু,
সে তো সন্ধ্যে থেকেই শুধু বেলুন ফুলিয়েছে।

১লা জানুয়ারি, ২০২০...
কত খাওয়া দাওয়া, আনন্দ শুধু তুমি এলে বলে।
প্রথম ক'দিন বেশ ভালই চলছিল,
তারপর একদিন তুমি আসল রূপে দেখা দিলে।
শুনলুম করোনা এসেছে দেশে,
ভাবলাম এ আবার কি! ও ঠিক সেরে যাবে।
কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না।
একে একে কত প্রাণ
তুমি নিয়ে নিলে,
তবু আজও তোমার খিদে মিটলো না।

২৫ সে জুলাই, ২০২০
আজ দু'দিন হয়ে গেল,
মন্টুর বাবা মারা গেল।
ও তো বুঝলই না যে এ তোমারই লীলা।
যারা সেবার বাতি জালিয়ে তোমায় ডেকেছিল, তারা আজ আকাশের তারা।
হয়তো ওদেরই ভুল ছিল,
তবু সবাই চুপ করে আছে, হয়তো ওদের ভাষাটাই হারিয়ে গেছে।

আজও সবাই অনেক আশা নিয়ে ঘুমোতে যায়, হয়তো এক নতুন ভোরের উদয় হবে। ওরা কখনো ভাবেনি একদিন সব হারিয়ে ফেলবে, শুধু তুমি আসবে বলে। শুধু তুমি আসবে বলে।

### মুখোশের আড়ালে

### সরস্বতী বেরা

দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতকোত্তর)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মুখোশে আমরা ঢেকেছি মুখ, হেঁটেছি অবিরত,
অন্ধকারে প্রকৃত মুখের মিছিল শত শত।
মুখোশের রঙ দারুণ রঙ্গিন – নীল, কালো আর সাদা,
পৃথিবীর বুকে মহামারী দেখালো মস্ত গোলকধাঁধা।
বিশ্বজুড়ে মারণ থাবা, নেই তো কেউ সুখে,
সমাজ আজ বদলে গেছে, মুখোশ সবার মুখে!

মুখোশ শুধু মুখে নয় জায়গা নিয়েছে মনে,
জগৎ ভুলে জায়গা দিয়েছে, একলা ঘরের কোণে।
বন্দী জীবন দিয়েছে নতুন ভাবনার অবকাশ,
নবরূপে নবভাবে মনের বহিঃপ্রকাশ।
চেনা-অচেনা সব মুখই আজ নব্য মুখোশে ঢাকা,
'করোনা', তুমি বুঝিয়ে দিয়েছো মানুষ কত একা।।

মুখোশ দিয়ে যতই ঢাকি, হবে মুখের প্রতিফলন, যখন মুখের সামনে বর্ষিত হবে সময়ের দর্পণ। মাক্ষের ভাঁজে বন্দী থাকে না মানব সভ্যতার ঘড়ি, নিরব বাক্যে থমকে গেছে অগ্রগতির সিঁড়ি। মুখ ঢেকেছে মানব সমাজ,বিপন্ন সারা বিশ্ব, অর্থাভাবে হাজারো মানুষ সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব!

স্তব্ধ সকল রাস্তা-ঘাট, শান্ত অলি-গলি,
চোখের সামনে ছটপট করে মানব অস্তিত্বের আকুলি।
গৃহের গণ্ডিতে কয়েদি আমরা নানান আলো আঁকি,
প্রকৃতির মুক্ত শ্বাস নিতে মুখোশের প্রলেপ মাখি।
অসহায় আজ বিশ্ব সমাজ, মোড়কের দুঃসহ আঘাতে,
তবুও নব পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি, মুখোশের আড়াল হতে।



# कूलिंगें जान हिल

### সৌরাশিষ রাউৎ

প্রাক্তনী, বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতকোত্তর, নেট কোয়ালিফায়েড) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

সকাল ছটার এলার্ম শুনে নিজেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে বুবুন। ব্রাশ করতে করতে ঘুম জড়ানো চোখেই রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে। মা বলছে, 'আজ আর স্কুলের জন্য রেডি হতে হবে না।' কথাটা কানে আসতেই চট করে ঘুম কেটে যায় বুবুনের। বড় বড় চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। মা কাছে এসে মুচকি হেসে বুবুনের গাল টিপে বলে, 'আর অবাক হতে হবে না, জানি জানি খুব আনন্দ হচ্ছে তোর। তবে শুধু আজ নয়, করোনা ভাইরাস এর জন্য এই এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখ অব্দি স্কুল ছুটি থাকবে তোদের। '

সত্যি, আনন্দ হচ্ছে বটে বুবুনের মায়ের কথা শুনে। অফুরন্ত আনন্দ। এত্তদিন স্কুল ছুটি, মানে বাড়িতে থেকে শুধু খেলা করা, টিভি দেখা, ড্রইং করা এসব কত্ত মজা হবে, এইসব ভাবতে থাকে বুবুন। আরো অনেক ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করে ফেলে সে। স্কুল বিষয়টা একদম পছন্দ নয় বুবুনের। শহরের নামজাদা এক ইংরেজি মাধ্যম বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্রী সে। স্কুলের চার দেওয়ালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বদ্ধ থাকা, পর পর ক্লাসের পর ক্লাস, মিসদের কথায় কথায় বকা দেওয়া, গাদা গাদা হোমওয়ার্ক দেওয়া এসব একটুও পছন্দ করে না বুবুন। তাই প্রায়শই স্কুল যাওয়া নিয়ে কাল্লাকাটি করে সে।

তবে বুবুন আরও কদিন পরে শোনে যে করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন না কি যেন একটা হয়েছে। সেটার মানে হল এখন বেশ কিছু দিন বাড়ি থেকে বেরোনো যাবেনা। তবে তাতে বিশেষ একটা দুঃখ নেই বুবুনের। কারণ বাড়িতে তার যে পুতুল মেয়েরা রয়েছে সেই মিনি, তুতুল এদের তো সময়ই দিতে পারেনা বুবুন। তাছাড়া এত পছন্দের দ্রুয়িং বুক, কালার পেন্সিল সেট সেগুলো নিয়েও তো বসতে হবে বুবুনকে। স্কুলের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একপ্রকার মনে মনে ধন্যবাদই জানায় বুবুন করোনা ভাইরাসকে।

এভাবেই দিন চলতে থাকে। মা বাবার মুখের আলোচনায় বুবুন জানতে পারে ওই যে করোনা নামে রোগটা, ওটা দিন দিন নাকি আরো পাওয়ারফুল হয়ে যাচ্ছে আর ওটার ওষুধ নাকি আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে বিজ্ঞানীরা। তাই লকডাউন নাকি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এদিকে তো বুবুনের সব পুতুল পুরনো হয়ে গেছে। ড্রিয়িং বুক, কালার পেন্সিল ও সব শেষের মুখে। কার্টুনের ছোটা ভীমও আর বুবুনের মন কাড়ে না। সব কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে বুবুনের। সে মা-বাবার কাছে বায়না করতে থাকে ঘুরতে যাওয়ার জন্য।

বেশ অনেকদিন এভাবেই চলতে থাকে। বুবুনের মনে, ব্যবহারে এক অদ্ভুত্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করেন বুবুনের মা। মেয়েটা আগের থেকে অনেক শান্ত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আনলক পর্ব শুরু হয়ে যায়। বুবুনদের প্রাইভেট কার থাকায় গাড়ি করে দাদু-দিদুন, কাকাই-কাকিন সবার সাথে দেখা করতে যায় বুবুনরা। সবার সাথে দেখা হওয়ায় অনেক আনন্দ পায় বুবুন। ইতিমধ্যে বুবুনের স্কুলে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে যায়। নাচের মিস-ও ভিডিও কলেই নাচ শেখাতে শুরু করেন।

এসব এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা বুবুনের। স্কুলের মিলি মিস, সুজাতা মিস ভিডিও কলে পড়া বোঝান, পড়া ধরেনও, কিন্তু কই ক্লাসের সবাইকে তো দেখতে পায়না বুবুন। মিঠু, রিংকি, রিতম যাদের পাশে ও বসতো ক্লাসে, টিফিন পিরিওডে যাদের খাওয়ারে ভাগ বসাতো, মাঠে খেলতে খেলতে প্রাণ খোলা হাসি হাসত ওরা, কই অমন তো হয় না এই অনলাইন ক্লাসে! স্কুলের দিনগুলো, বন্ধুদের খুব মিস করে বুবুন। চোখে জলও এসে যায় তার। ছুটে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে- 'মা, স্কুল কবে যাব আমরা?' মা উত্তরে বলেন-'জানিনা'। এভাবেই বাবা, ঠাম্মা সবাইকে এক প্রশ্ন করে বুবুন। কিন্তু উত্তর পায়না। এমনকি গতকাল অনলাইন ক্লাসে সবথেকে রাগী অপর্ণা মিসকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে বসে বুবুন-'মিস, স্কুল কবে যাব ?' কিন্তু একইরকম ভাবে উনিও হতাশ করেন বুবুনকে।

একদিন হঠাৎ ঘুমের ঘোরে বুবুন শুনতে পায় মা বলছে- 'এই বুবুন তাড়াতাড়ি উঠে রেডি হয়ে নে টেবিলে ব্রেকফাস্ট রেডি আছে তোর পছন্দের চিজ স্যান্ডউইচ, খেয়ে ইউনিফর্ম পরে নে তাড়াতাড়ি, স্কুল বাস চলে আসবে তো'। বুবুন মনের আনন্দে চেঁচিয়ে বলে- 'হ্যাঁ মা আসছি'। হঠাৎ মায়ের ঠেলা খেয়ে ঘুমটা ভেঙে যায়। ঘুম জড়ানো চোখে মায়ের গলার আওয়াজ শুনতে পায়- 'এই বুবুন ওঠ ওঠ, কি সব বলছিস ঘুমের ঘোরে, কোথায় যাবি তুই?' ঘুমটা ভেঙে যায় বুবুনের। আবার একরাশ নিরাশা ঘিরে ধরে তাকে। মনের মধ্যে একটা ভয় জমতে থাকে যে তার এই স্বপ্লটা কি কোনদিন সত্যি হবে না আর?

বুবুন বোঝেনা কি যেন একটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে ওর। এমনই তো একটা জীবন চেয়েছিল ও। স্কুল যেতে হবে না, কোথাও বেরোতে হবে না, সারাদিন শুধু খেলা, টিভি দেখা, ড্রইং করা এসব নিয়েই মত্ত থাকবে ও। তবে কিসের জন্য ওর এত্ত মনে পড়ে স্কুলের দিনগুলোকে এখন? কেন প্রাণটা ছটফট করে স্কুলে ফিরে যাওয়ার জন্য? উত্তর হাতড়ে বেড়ায় বুবুন নিজে নিজেই। এখন আর এসব প্রশ্ন করে কাউকে বিরক্ত করে না সে। খাটের পাশের জানালাটা থেকে প্রায়শই তাকিয়ে থাকে বাইরের খোলা আকাশের দিকে যেখানে বিকেলে এক ঝাঁক টিয়া ইচ্ছে মতো উড়ে বেড়ায়, খেলে বেড়ায় খোলা আকাশে। সেদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রোজ বুবুন আর ভাবতে থাকে সেও কবে তার বন্ধুদের হাত ধরে দলবেধে ছুটে বেড়াবে, প্রজাপতির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াবে। বুবুনের মা অনেকদিন ধরেই খেয়াল করেছেন মেয়ের মধ্যেকার এই পরিবর্তনকে। মনে-মনে মেয়ের এই পরিবর্তনে কন্ট পেলেও একদিক থেকে সন্তুন্ত হন এই ভেবে যে, করোনা এত মানুষকে এত শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তার ছোট্ট বুবুনকে স্কুলকে ভালবাসতে, নিজের কাছে থাকা জিনিসকে কদর করতে শিখিয়ে দিয়েছে।

# তোমার মত বন্ধু পেলে

সেক নাসিম মহম্মদ

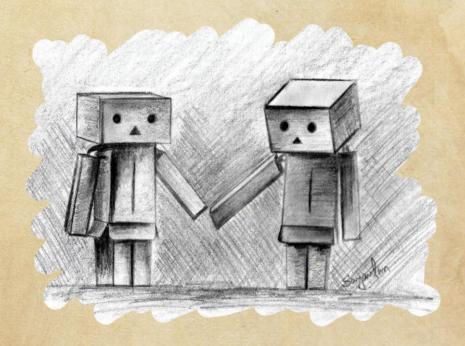
দ্বিতীয় সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

তোমার মত বন্ধু পেলে বাঁচবো অনেক দিন, ভুলব সকল লেনা-দেনা, শুধাব প্রাণের ঋণ।

তোমার মত বন্ধু পেলে করবো দুঃখ জয়, ঘুচিয়ে দেব জ্বর-জ্বালা, ভুলে যাবো সকল ভয়।

তোমার মত বন্ধু পেলে জগৎ পেয়ে যাবো, সকল পরাজয় কাটিয়ে জয়েরই গান গাবো।

তোমার মত বন্ধু পেলে থাকবে হাতে হাত, মানবতার ফুল ছড়িয়ে ভুলবো গো জাতপাত।



### পণ প্রথা

### সেক নাসিম মহম্মদ

দ্বিতীয় সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ছোট্ট খুকু জন্ম নিল पतिष সংসারে, বাবা-মায়ের ভালোবাসায় **जिन जिन वार्**ष् খুকুর বয়স বাড়তে থাকে क्त्य फिल फिल, বাবা-মায়ের চিন্তা বাড়ে চিন্তা বিয়ের পণে। পাত্রপক্ষ দেখতে আসেন, হরেক রকম দাবী, গয়নাগাটি, নগদ টাকা, ফ্রিজ, রেডিও, টিভি। খুকুর বাবা চিন্তা করে কেমন করে দেবে, চিন্তা বাড়ে, কূলকিনারা পায় না কিছুই ভেবে, পণের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে সবারে মুক্ত ক'রে, বাবা-মায়ের মেহের প্রদীপ जुलिं या घत्त, হঠাৎ সেটি নিভে গেল পণ প্রথারই ঝড়ে।



### **Naughty Beloved**

#### **Debabrata Utthasini**

4<sup>th</sup> Semester
Department of English (P.G.)
Pingla Thana Mahavidyalaya

I always find strange her,
My heart whispers forever.
Oh! Her smile is a flowing stream,
She always doth my dream.

O God, how did you make her!
The conjunction is so far.
She attracts my attention
And then makes me a fun.

Oh! That of the eyes,
Always brings only lies.
Though she is my dream girl,
She is full of curl.

Oh! I am obsessed with pain, I never shall her gain.

### মা আমার মা

অনিমা সামন্ত দ্বিতীয় সেমেস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (স্নাতক, সান্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মা, মা, ও-মা ডাকি শুধু মা, আজ আমি বড়ো হয়েছি। নেইকো পাশে তুমি. তোমার কথা মনে পড়ে সারাটা সময় মা। সেই যে তুমি খাইয়ে দিতে আদর করে শুইয়ে দিতে। মনেপডে শুধু সেই কথাগুলি. সেই যে তুমি বলতে আমায় বড় হবি তুই খোকা, বিশ্ব তোকে চিন্বে শুধু তুই আমার খোকা, আমি তখন আদর করে জডিয়ে ধরবো তোকে। আজ আমি বড়ো হয়েছি বিশ্ব আমায় চেনে. আমার কাছে সবই আছে শুধু নেইকো তুমি মা। তুমি তো বলেছিলে -সারাটা সময় আদর করবে আমায়, ভালোবাসবে আমায়। এখন তবে আদর. কেনো করো না মা? সেই যে তুমি ছেড়ে চলে গেলে আমায়, বাবাও থাকে একা একা। তাইতো সারা সময় ডাকতে থাকি মা, মা - ও মা, আমার মা।

### নব প্রলেপ

# সঞ্জয় প্রামানিক

প্রাক্তনী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

প্রকৃতি হাসছে প্রাণখুলে!
ঋতুর বৈচিত্র্য গেল চলে।
শৈশবের পাঠ্য বই,
ঋতুর মিল পেল কই!
অবাক করা এই বৈচিত্র্য গড়ার;
অবদান নভেল করোনার।

বিহ্বল মোরা, টেনেছি রাশ;
মুছেছি কত শত অবকাশ।
নিওওয়াইজ ও পারসেডেদের শত আগমন,
এনেছে মহাকাশভরা অন্য জাগরণ।
নব কিশলয় খেলছে আজদুলছে শিকল খুলে,
মুক্তির স্বাদে সিক্ত হৃদয়;
উঠছে আজকে দুলে।

লেন্সে পড়ল ধরা অভিসারের ভ্রমরকূল,
প্রাঞ্জল ওরা, সুখের তরে ব্যাকুল!
এ মনের সীমানা ছাড়িয়ে;
ওদের পানে ফেরাই মুখ,
সকল হিসেব মিটিয়ে দেখি ঝিনুক মালার অতীত সুখ।



# সমাজ জীবনে ন্যায় নীতি ও মূল্যবাধের অবক্ষয়

### সুদীপ্তা মানা

চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আমরা যে ভৌগলিক অঞ্চলে বাস করি সেই অঞ্চলের প্রকৃতি ও সমাজকে <mark>কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আমাদের পরিবেশ। পরিবেশের সুস্থিতির ওপর মানব সমাজের</mark> <mark>কল্যাণ নির্ভর করে। একটা সুস্থ সমাজ মানুষের জীবনে অনেক প্রভাব ফেলে যেমন ব্যক্তিত্ব ,</mark> <mark>মানসিক বিকাশ প্রভৃতি। আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত মানুষজন ও তাদের সুখ-দুঃখ</mark> সবই সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এখানে ন্যায়-নীতি যা সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। কথায় বলে, "সবার ওপরে মানুষ সত্য "। মানুষ যদি ন্যায় -নীতিকে আদর্শ করে না বাঁচে তাহলে সমাজের অবক্ষয় অবধারিত। মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ মানুষ অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করুক এটাই চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানবের ধর্ম হলো মানবের কল্যাণ চিন্তা করা ও তার পাশে দাঁড়ানো। স্বামী বিবেকান্দ বলেছিলেন "পরোপকারই কর্ম-আর সবই অকর্ম"। মূল্যবোধ মানুষকে শেখায় জীবনে সৎ ভাবে চলার মূল্য ও সৎ পথে জীবন ধারণ করা। তাই প্রয়োজন জীবনের শুরুতেই মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন <mark>হওয়া। সামাজিক মূল্যবোধ ,ন্যায় ব</mark>োধ ,নীতিবোধ আর সংযমের মহান আদর্শকে জীবনের চলার পথে সাথী করা উঠিত। এই মূল্যবোধকে যারা আদর্শ হিসাবে না মেনে চলে তার জীবনে পুঁথিগত শিক্ষা নিক্ষল। বর্তমান সমাজের 'মূল্যবোধ 'একটি অবহেলিত শব্দ মাত্র। এই শব্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে অক্ষম সমাজের বেশির ভাগ মানুষ। যার ফলে সমাজে ঢোকে মূল্যবাধের অবক্ষয়। হিংসা ,লড়াই ,সমাজের মূল্যবাধের অবক্ষয় এর শিকার তরুণ যুব সমাজ। এদেরকে কাজে লাগিয়ে মানুষ কুপথে নানা টাকা উপার্জন করছে। এক শ্রেণীর মানুষ অপর শ্রেণীর মানুষকে শোষণ করছে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার এক মাত্র উপায় সমাজের সব মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা, বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, <mark>মহান মনীষীদের জীবনী পাঠ করা প্রভৃতি। সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে সমাজের মূল্যবোধের</mark> অবক্ষয় রোধ করতে হবে। ন্যায়-নীতি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাতে সমাজ ও পরিবেশ জীবন সবার জন্য মঙ্গলময় হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে, 'যে শিক্ষা অন্তরে অমৃত, তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব'।

#### Covid-19: Not A Bliss

#### **Subhasis Mandal**

4th Semester, Department of English (P.G.)
Pingla Thana Mahavidyalaya

Nature says Corona is my curse,
You people made me ruthless farce.
I know you are not for love,
Only in fear of death you do shove.
You're a stupid selfish human being,
You don't have any idea about my mighty sting.
I'm the destroyer and the preserver;
Don't try to go too far.

Look at Italy, China, America and Spain;
Beloved India is too in agony and pain.
Look at Italy, a number of wounded and dead;
Unfortunate men can't get enough bed.
We live in the world of fate,
Like them we can't stake.

It is again and again told,
Look at the child and the old.
They want to learn, they want to live.
Give them chance to better survive.

A frown peeps in village and town,
As we have to follow this long lockdown!
Shall we be able to maintain this fast?
Government says you have to do it, keep trust.

If you stay at home in lockdown days, You can come out from Corona cage. On your behalf, follow every task; Wash your hands and wear a mask. Don't go outside and don't roam. Please stay safe and stay at home. Forget religion, race and caste.
We have to win this living fast.
There is no politics beyond death,
You should live first and then have faith.
Now all glories are in utmost vain.
The proper study of mankind is man.

Do some supportive and creative job, Please don't create any more mob. We were patient in our mother's womb, A man is patient even in his tomb.

#### মা

টুম্পা পাত্র দ্বিতীয় সেমেস্টার বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

স্নেহময়ী 'মা' আমার মাটির প্রতিমা,
গর্ভধারিণী মায়ের নেই কোন তুলনা।
সুখ-দুঃখের সংসারেতে নেইকো তুলনা যার,
সারাজীবন নিল প্রতিশ্রুতি সন্তানদের মানুষ করবার।
টাকা-কড়ি ধন-সম্পদ সবকিছুই দিলেও
মায়ের ঋণ শোধ হবে না সারা জীবন ধরেও।
সারা দেশে 'মা' ডাকটি শুনতে বড় ভালো,
'মা' ছাড়া যে মোদের গতি সব দিকেতেই কালো।



### জীবন

শ্বেতা ভৌমিক
চতুর্থ সেমেস্টার
বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মানুষ ঠিক ফুলের মতো হয়।
কিছু ভালোবাসা পায়, কিছু বিবেচিত হয়,
কিছু যত্ন পায়, আর কিছু স্মরণাতীত হয়,
তারই মধ্যে কিছু আমাদের চেনা-জানা, আর,
কিছু নয়।
মানুষ একদম ফুলের মতো।
আমরা সবাই সৌষ্ঠভাবে জন্মগ্রহণ করি,
আমাদের নিজস্ব ছন্দে,
কিন্তু সবাই তা দেখে না।
কিছু শুকনো ফুলের মতো
কিছু শ্লান হয়ে যায়, আর কিছু প্রাণ হারায়,
কারণ তারা হাল ছেড়ে দেয়।
কিন্তু তারইমধ্যে কিছু উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হয়।

# পুরানো সেই দিনের কথা

### সমাপ্তি পাত্র

চতুর্থ সেমেস্টার, ইংলিশ বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

"আজ মঙ্গলবার, পাড়ার জঙ্গল সাফ কবার দিন।" তবে আজ মঙ্গলবার নয়, ক্যালেন্ডার মতে আজ রবিবার । আর কোনো পাড়ার জঙ্গল সাফ করতে হবে না সৌরিমাকে। তবে তাকে আজ তার বাড়ির স্টোর রুমটা পরিস্কার করতে হবে। গত দুদিন ধরে সারা বাড়িময় এক অসহ্য বিদঘুটে গন্ধের আনাগোনা অনুভব করছেন বাড়ির সদস্যরা। আর তার মধ্যেই বাড়ির কর্তা আবিষ্কার করলেন গন্ধটা স্টোর রুম থেকেই আসছে তার দৃঢ় বিশ্বাস কোনো ইঁদুরই হল এই ঘটনার প্রকৃত আসামি। বাড়ির সকল সদস্যের সর্বসম্মতিতে এই রহস্য ভেদের দায়িত্ব পড়ল সৌরিমার উপর।

আজ রবিবার – ছুটির দিন। আজই এই অসহ্যকর গন্ধের সমাধান করতে হবে। গত এক সপ্তাহ হল কাজের মাসী ছুটি নিয়েছে, তাই সংসারের সকল কাজ এসে পড়ল সৌরিমার কাঁধে, আর সৌরিমাও যেন দশভূজা, সংসার-অফিস দুই-ই দিক ঠিক সমান তালে সামলে নিয়েছে। তাইতো গন্ধ রহস্য ভেদ করার জন্য বাড়ির সদস্যরা সৌরিমাকেই উপযুক্ত ফেলুদা মনে করেছে।

"এই সোনাই, পাপা এলে দরজাটা খুলে দিস তো। আমি এখন স্টোর রুমে যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, তোর ড্রয়িং হয়ে গেলে খালি বোতলগুলো জল ভরে ফ্রিজে রেখে দিবি। বুঝলি…" "হ্যাঁ মাম্মা, ঠিক আছে তুমি এখন যাও তো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি। শোন গ্যাসের কাছে যাবি না কিন্তু, আমি বিরিয়ানি চাপিয়ে এসেছি। একটু পরে দেখে যাবো। এখন যাই দেখি গিয়ে স্টোররুমের কি অবস্থা হয়েছে..." টিভির নিচের দ্রুয়ার থেকে একটা ছোটো লাল রঙের ব্যাগ থেকে একগোছা চাবি বের করল সৌরিমা এবং তার থেকে খুঁজে একটা ছোটো চাবি নিয়ে স্টোর রুমের দিকে চলে গেল। " ইস! অসহ্য গন্ধ", নাকে হাত চাপা দিয়ে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বালিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল সৌরিমা। রুমের জানালাগুলো আগে খুলে দিল, তারপর সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিল। রুমটি আগাগোড়া পুরোনো আসবাবপত্র, পুরোনো বই, ফাইল, পুরোনো খবরের কাগজ, সোনাই আর তাতানের পুরোনো খেলনা ইত্যাদি নানান পুরোনো অব্যবহৃত সামগ্রীতে ঠাসা। "ইস! কি করে রেখেছে রুমটাকে ! জিনিসপত্রগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার নাম নেই একটুও। এমন ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে রাখলে ইঁদুর-ছুঁচো হবে না কেন?" বলতে বলতে জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে ঝাড়াঝাড়ি করতে লাগলো সৌরিমা। " কি অবস্থা! কত দিন যে স্টোর রুম পরিস্কার হয়নি তা বোঝাই যাচ্ছে, যে দিকে নজর দেবো না সেই দিক অচল হয়ে পড়ে থাকে...।" গজগজ করতে করতে সৌরিমা পুরোনো কাঠের বুকসেলফগুলোর দিকে গেলো। সৌরিমা খুব আধুনিক রুচিশীল মেয়ে, তার বাড়ির নিখুঁত সাজ পরিবেশ দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। তাই পুরোনো সেকেলে মান্ধাতা আমলের আসবাবপত্র ঠাঁই পেয়েছে বাডির স্টোর রুমে।

"উফফ! কতবার সৌরভকে বললাম অপ্রয়োজনীয় পুরোনো কাগজপত্রগুলো জ্বালিয়ে দাও। না! উনি তা শুনবেন কেন সেই যক্ষের ধনের মতো এখানে জমা করে রেখেছেন, এখন এগুলোকে যে কোথায় রাখি…"

धर् !! धर् !! धर् !!

"যা! যা! একি হল? এতো বাড়তি কাজ হয়ে গেল! ধুর!"

উপরের ঝুলগুলো ঝড়তে গিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাত লেগে সেলফের উপরে থাকা একটা মাঝারি কাগজের বাক্স ধপ্ করে মেঝেতে পড়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে জিনিসগুলো তুলবে বলে যেই না সৌরিমা নীচু হলো হঠাৎ সৌরিমার বুকের মাঝে উত্তাল ঢেউ তরঙ্গ বয়ে গেলো। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো, চঞ্চল সৌরিমা এক নিমেষে পাথুরে প্রতিমা হয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল। হাত-পা নিমেষে শীতল হয়ে গেল, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, বুকের মাঝে তখন প্রবল জলোচ্ছাস।

ধীরে ধীরে সৌরিমার হাতদুটো এগিয়ে গেলো একটি হালকা গোলাপি কভারে মোড়া অ্যালবামের দিকে। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসগুলোও তার বড্ড চেনা। বুকের সাগরে এখন ভাঁটা পড়েছে, কানে আসছে হুৎপিন্ডের ধুকপুক স্পন্দন ধ্বনি। আলতো ছোঁয়ায় সামনের অন্ধকার কুয়াশা সরে গিয়ে স্পষ্ট হয়েছে ভোরের সূর্যোদয়। আ্যালবামের প্রত্যেক ভাঁজে সৌরিমা খুঁজে পাচ্ছে সেই চেনা রুপ-রস-গন্ধ।

"এই সৌরিমা, তুই কিন্তু চিটিং করছিস, আমি আর খেলবো না বলে লুডোর গুটিগুলো ঘেঁটে দিয়ে নিশা রেগে উঠে পড়ল।

"আরে থাম! ভাই, এতো রাগ করছিস কেনো ? তোরা তো জানিস আমাদের সৌরিমা হারতে পছন্দ করে না। বলে রাহুল নিশার কানে কানে গিয়ে বলল "আজ মুভি দেখার খরচ সৌরিমা দেবে"।

"ইটস নট ফেয়ার! তা বলে খেলাটা নষ্ট করতে হবে?" প্রতিবাদের সুরে মল্লিকা বলে উঠার সাথে সাথেই অমিত বলে উঠলো আচ্ছা তোরা মুভি দেখতে যাবি যে? চল রেডি হয়ে নে। তোদের তো সেই লেট। ৫-৬ ঘন্টা লাগে বেরোতে…"

চোখের সামনে পুরোনো দিনগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল সৌরিমার কাছে। হঠাৎ করে নিজের অজান্তেই চোখের সামনেটা ঝাপসা হয়ে উঠল। চির বসন্তের মাঝে একি! বর্ষা এলো কী করে? সামনে পড়ে থাকা গিফটগুলোর দিকে। তাকাতেই সৌরিমার দেহ—মন ভেসে গেল স্বপ্নের রাজ্যে যেখানে সৌরিমাকে ঘিরে রয়েছে তার বন্ধুরা, যাদের সাথে আড্ডা, খুনসুটি, মজা, তামাশা করে সেরিমা পেরিয়ে এসেছে তার স্কুল ও কলেজ জীবন। জীবনের প্রত্যেক ধাপে সৌরিমা পেয়েছে তাদের সঙ্গ, সেই তারা আজ হারিয়ে গেছে ব্যস্ততার ভিড়ে। আধুনিক ব্যস্ততার করাল ছায়া ঢেকে দিয়েছে বন্ধুত্বের আলোক উৎসকে। তবে আজও তারা আছে । ফোনের কন্টান্ট লিস্টে আজও দেখা যায় সেই চেনা নাম্বারগুলোকে। চ্যাট লিস্টে সেই 'ফ্রেন্ডস ফর এভার' গ্রুপটি আজও আছে। তবে আগের মতো টিং টিং করে অজস্র নোটিফিকেশন আসে না।

নামি কর্পোরেট অফিসে কর্মরতা সৌরিমা কাজ ও সংসারের মধ্যে নিজেকে এমন আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে যে সেখানে নিজের ইচ্ছাগুলো জেগে ওঠার আগেই অসহায়ভাবে মারা যায়। আগের মতো সময় দিতে পারে না পুরোনো সম্পর্কগুলোকে। ব্যস্ততার মোড়কে কোনো মতে বেঁচে আছে বন্ধুত্বের গল্পগুলো।

মেঝেতে উল্টো করে পড়ে থাকা ফটো ফ্রেমটিকে তুলে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে সৌরিমা সশব্দে কেঁদে উঠলো। আর যে নিজেকে সামলানো যায় না। যেন এক মা বহু দিন পর তার হারানো সন্তান আবার ফিরে পেল। চোখের জলে ভিজে গেল ধূলো মলিন সেই ফটোফ্রেমটা। কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে এক মৃদু সুর... "পুরানো সেই দিনের কথা, ভুলবি কি রে হায়-- ও সেই চোখের দেখা, প্রানের কথা, সেকি ভোলা যায় …"

"মাম্মা! তাড়াতাড়ি চলো দেখো ওদিকে কি হয়েছে! ও মাম্মা!"

<mark>হ্যাঁ! প্রায় চমকে উঠলো সৌরিমা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সোনাই এর কথা এই মাত্র</mark> শুনতে পেল সে।

"কি যে করছো! বিরিয়ানি যে পুড়ে গেল! চল তাড়াতাড়ি!"

সোনাই এর ডাকে সৌরিমা বাস্তবের মাটিতে নেমে এলো। নাকে এলো বিরিয়ানির পোড়া গন্ধ। "ইস! একদম খেয়াল নেই রে, চল শিগগির চল দেখি গিয়ে…" পুরো কথা শেষ হতে না হতেই সৌরিমা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেঝেতে পড়ে থাকা কার্ড, গিফটগুলোর উপরে সেই আধ ভেজা পুরোনো ফটোফ্রেম মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।

# প্রিয় মুখ

### পুষ্পেন্দু মণ্ডল

দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতকোত্তর)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ভেঙেচুরে স্বপ্নগুলো, আজ ধীরে ধীরে ও'গলিতে গিয়ে হাজির, कृ विम वालात जग९ गिर्क थानि कार्थ प्रथा यार ना। <mark>দু'চোখে ছায়ার মতো পিষে থাকে ধোঁয়াশা, ছাই পোড়া দাগে।</mark> আমি চলে যাব, মৃত্যুপুরীতে। ভুলে যাব এ জগতের যত মায়া--আমার রাগ, ভুলে যাবে তাদের, যারা আমায় আঁকড়ে ধরে, আমায় শোষণ করেছিল। আমার সৃষ্টি, আমার ঋণ, আমার ভালোবাসা, এ জগতের বুকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবে। **७४ পृथिवी वाभाग्न काँकि प्राट्य**। <mark>নতুন ভোর আমার মতোই পড়ন্ত</mark> বেলায় জীবনের শেষ ডাকে। তবে সে আবার ফিরে আসে, আলো জ্বালাতে। কিন্তু আমি আর আসব না। <mark>আমার দুঃখণ্ডলোর গভীরতা, এত অবহেলা সহ্য করতে পারে না।</mark> ভালোবাসা ফিরিয়ে নিও আমার বুক থেকে। আমি যে প্রতিচ্ছবি এঁকেছিলাম, তোমার ভরা ছাদে, তার স্বচ্ছতা ঝাপসা হয়ে গেছে। নেপোর আঁতুড়ঘরে আমি ঠাঁই পেলাম না। <mark>সিনে পর্দার আড়ালে আমার প্রতিভা হয়তো ফিকেই রয়ে যাবে।</mark> পাহাড় ছুঁতে চেয়ে, কত চাপা কষ্ট বুকে মরতে থাকে দিনের পর দিন। আমি মেবারের যুদ্ধ হেরেও, <mark>ইতিহাসের পাতায় দুএকটা আঁচড়ের দাগ হয়তো রেখে যাব।</mark> প্রতিশোধের আর প্রতিবাদের পথ আত্মহত্যা নয় আমি জানি। আমি রাজপুত, ভয় ডর আমার লাগে না। কত পথিক পথ হারিয়ে যায়, এই বিশাল জনসভায়, বিবর্ণ আস্তাকুঁড়ে আমি এক জীবন্ত লাশ। ওদের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা আমার আর ছিল না। তবুও বাঁচতে চেয়েছিলাম, স্বচ্ছভাবে। কিন্তু মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে আত্মহত্যার বৈধতা, নিঃশ্বাসের ঠোঁটে চুমুর মতই আমার প্রাণনাশ হতে থাকে প্রতিদিন। আকাশের মাথায় উঁচু মৃত্যুর রাস্তায় আমার রূপের আলোটুকু নেই। দেহটা নিরুত্তর হয়ে পড়ে থাকে। প্রিয়মুখটা ছবি হয়ে যায়। (সুশান্ত সিং রাজপুত স্মরণে)

# কিছু মন দিলাম

### পরিমল মানা

দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

কিছু স্বপ্নের রং দিলাম-ফ্যাকাসে ক্যানভাসে
ভাঙা ভাঙা ক্লিষ্ট মুখগুলোর
বিবর্ণ পেনসিল-স্কেচ এর ওপর
তুলি টেনে একটু উজ্জ্বল করো।

কিছু শব্দ দিলাম-মিছিল এ শেখানো স্লোগান দিতে দিতে
যারা জীবনের সহজ বুলি হারিয়েছে,
তাদের মুখে জীবনের ভাষা
ফুটিয়ে দাও।

কিছু জোনাকি জ্বালা রাত দিলাম-হতাশার অন্ধকারে
বাঁচার পথ খুঁজে খুঁজে
হারিয়ে যাচ্ছে যারা,
তাদের সামনে জ্বালো
একখণ্ড চাঁদনী আলো।

কিছু মা দিলাম--অস্তমিত সমাজের জন্য জন্ম দিক কিছু প্রতীক! গড়বে নতুন সমাজ।

কিছু মন দিলাম-শতঘাত দীর্ণ পাঁজরের আড়ালে
সন্তর্পনে বসিয়ে দাও,
দ্যাখো আবার আগের মতোই
স্পন্দিত হবে
ওদের হারিয়ে যাওয়া শুভ চেতনা।

### মাটির পাত্র নির্মাণ পদ্ধতি ও ব্যবহার প্রকল্প

#### গনেশ চন্দ্ৰ পাল

চতুর্থ সেমেস্টার, কলা বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মাটির যে কোন পাত্র বা বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করতে আমাদের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ও বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করতে হয়। প্রথমে আমাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আয়োজন করতে হয়। যেমন-

- (১) চাকা- (i) ইলেকট্রিক চাকা হলে পরিমান মতো গতি রাখতে হবে।
- (ii) হাত দিয়ে ঘোরানোতে খুব ভালো ভাবে শেখা সম্ভব হয়।
- (২) মাটি- (i) এঁটেল মাটির সঙ্গে পরিমাণ মতো পলিমাটি মিশিয়ে অথবা নোনা মাটির সাথে পরিমান মতো এঁটেল মাটি মিশিয়ে করা সম্ভব হয়।
- (৩) <mark>জল- মাটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মতো জল দিতে হবে, যাতে নরম না হয়ে যায়। নরম</mark> হয়ে গেলে শক্ত করতে হবে।
- (8) **সুতো- ১২–১৫** ইঞ্চির মতো সুতোর প্রয়োজন।
- (৫) **অন্যান্য** একটি বা দুটি ছুরি প্রয়োজন, চট বা থলে, কোদাল, চৌকি, ও অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি।

প্রথমে আমরা নির্মাণ পদ্ধতি শুরু করার আগে প্রস্তুতির স্তরকে কয়েকটি ধাপ বা পর্যায়ে ভাগ করে নেবো।

১ম পর্যায়- (i) নরম মাটিকে ভালো ভাবে মিশিয়ে রৌদ্রে শক্ত করার জন্য দিতে হবে।



- (ii) সেই মাটিকে ভালো ভাবে উল্টেপাল্টে 8 ৫ বার মাড়াতে হবে।
- (iii) তারপর ভালোভাবে পরিমান মতো মাটি নিয়ে চাকার ওপর বসাতে হবে।



২য় পর্যায়- (i) চাকার গতি প্রয়োজন মতো রাখতে হবে। এখানে আমি একটি টব তৈরি করছি। হাতের সাহায্যে তৈরির পর সুতো দিয়ে কেটে রাখলাম।



(ii) এই টবটিকে শক্ত করার জন্য রৌদ্রে দিলাম। এরপর নক্সা করা হয়। এবং সাইজ করা হয়। এরপর টবটিকে পুরো শুকনো করলাম।



<mark>৩য় পর্যায়-</mark> রৌদ্রে শুকনোর পর রং দিতে হবে। আমরা এই টবে মাটির রং দিলাম। ৪র্থ পর্যায়- এই টবটিকে ভালোভাবে সাইজ করে পোড়ানোর জন্য ভাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়।



অন্তিম পর্যায়- পোড়ানোর পর বাজারে বিক্রি করা হয়। চাইলে রং করা যায়।



ব্যবহার- মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি করা হয়। বিভিন্ন চারাগাছ ও বাগানে ফুলের ও বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

#### কলম

### পুষ্পেন্দু মণ্ডল

দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্নাতকোত্তর)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

কবির বুকে তুমিই প্রথম আশা দেখিয়েছিলে, ইতিহাসের ললাটে সভ্যতার মুখোশের ছাপে। মনের কালিমা যেদিন ফুটে উঠেছিল তোমার নিবে, কলমের কালিতে ঝরেছিল অজস্র ব্যথা, পাতায় পাতায় কোন একদিনে।

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সেইজন যার কাছে তুমি অস্ত্র সাজো, স্রস্টার সৃষ্টিকে তুমি একমুঠো স্বাধীনতা দিয়েছো। তাদের বুকে আগুন জ্বালাও প্রতিবাদের আঘাতে আঘাতে, তোমার মিছিলে বিদ্রোহী সুর কত অনুতাপ লেখে প্রতিরাতে।

অপ্রকাশিত শতশত কথাদের চিহ্ন জ্বালিয়ে রাখো অন্ধকারে, দেওয়াল ভেঙে, মাটির দেহে নরম স্রোতধারা মিথ্যাগুলোর ঝড়ে। তোমার ভাঙা ঠোঁটে আসামির শাস্তি পাঁজর ভাঙে। ফোঁটা ফোঁটা কালো ঘামে কষ্ট মেটাও নীল দিগন্তে।

ভাঙতে শেখাও গড়তে শেখাও, জাগাও শক্তি প্রাণে, অসাড় দেহে মৃত আলো বন্দি থাকে অভিমানে। হৃদয় ভাঙলে তুমি জোড়া দাও পরস্পরের অবহেলা, অউহাসি তোমার নিবে নীরব থাকে, যত প্রেম খেলা।

অক্ষরে অক্ষরে রক্ত চুষে নেতাদের প্রলোভন, ক্লান্তিহীন শরীর জুড়ে তোমার লেখার মিথ্যা প্রচারণ। অবসরের ছায়া পেলে আরাম-কেদারাই বসে লেখক, শব্দের ঝড়ে ডাইরি ভরায় তোমার বীজের প্রহরে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ছড়িয়ে যায় পায়ের দাগ।
মোহনামুখে বালির ঢেউয়ে খামখেয়ালী ছবি আঁকো,
তবুও কেন জল ছোঁয় না জীবন অভি-সারে।
কলম, তুমি একখন্ড চোখের জলে দুঃখিদের গায়ের বৃষ্টিপাত মেপে,
নামহীন কোন ফুলের গন্ধে চিঠি লিখে যাও ঘুমন্ত দেহে।

খেয়ালীগায়ক আদিঅন্তহীন সুরে সুরে ফেরার রাস্তায় গান ধরে, মরীচিকার বালুচরে বৃষ্টি নামলে, পুরানো ঢেকে যায় নব্যত্ত্বের স্তরে। প্রানবন্ত তুমি, উদাসীন করেছ আমায় সার্বভৌমত্বের নেশায়, কত অপরাধ, কত হিংস্রতা তোমাকে নিয়েই, তবুও তুমি কালি ঝরিয়ে যাও সংকোচহীনতায়। তোমার বীর্যে নিজস্ব দেহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রোজ, সমাজের ভিড়টা কোলাহলে চুঁইয়ে ছলকে ওঠে। এলোকেশী মেঘ আঁকো অচেনা মুখের---একফোঁটা কালির রস সারা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে রক্তভেজা গল্প লিখতে।

আমার বন্ধু তুমি, দয়া করেছ হৃদয়ের সুখে,
মানবী-সত্ত্বায়--তুমি প্রেম হয়ে আমার আঙুল-স্পর্শে প্রতিধ্বনিত হও এই সভ্যতায়।
মন আমার আকাশের বুকে, তুমি কখনো ছলনা করোনি,
আজও লুকিয়ে রেখেছ, প্রত্যাশী চোখে সুখের চিলেকোঠায়।
রাষ্ট্র গান এখনও রঙিন, জোৎস্লামাখা জোনাকির মতো,
আমি লিখি, জগত দেখে, আমার মৃত চোখে উকিঝুঁকি অনবরত।

### বাংলা ভাষা

প্রশান্ত দাস

চতুর্থ সেমেস্টার বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাংলা আমার সব, শিশুর মুখে প্রথম ফোটে বাংলা ভাষার রব। বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাংলা আমার প্রাণ। বাংলা আমি ভালবাসি. বাংলাতে গাই গান। বাংলা মোদের মাতৃভাষা, বাংলাতে হয় জ্ঞানী, রেডিও তরঙ্গ খুঁজে পেয়েছিলেন বাঙালি এক বিজ্ঞানী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর वानिस्रिष्ट्रिलन वर्णश्रित्रम्, বাংলা ভাষা শিখলে পরে অনেক জ্ঞানলাভ হয়।





### পথের দিশা

মনিদীপা বেরা

দ্বিতীয় সেমেস্টার বাংলা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

অসীম সাগরে তুমি ধরেছো হাল, ঠিক পথে চালনা করো নৌকার পাল। উত্তাল সমুদ্রে দেখিয়েছো পথের দিশা, সেই পথে অন্ধকার কাটিয়ে পেয়েছি রবির দেখা। শিল্পির ছোঁয়ায় যেমন মূর্তি পায় প্রাণ, তেমনি তোমার ছোঁয়ায় হয় শিশুর কল্যাণ। আজকের শিশু হয় আগামীর দিশা, সেই দিশা দেখিয়ে তুমি ধরনীতে কাটিয়েছো নিশা। শিক্ষার স্তম্ভ তুমি, জাতির মেরুদণ্ড জাতির জীবন পথে আনো অগ্রগতির ছন্দ। শিক্ষক মহাশয় তুমি, ছাত্রদের অলংকার, বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক হয়ে দেখাও আমাদের পথের দিশা।

# ৭ই সেপ্টেম্বর: 'নীল আকাশের জন্য নির্মল বাতাস'—আন্তর্জাতিক দিবস শিল্পা কর্শর্মা

দ্বিতীয় সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, (স্নাতক, সান্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

প্রায় তিনশ বছর আগের শিল্প বিপ্লব পৃথিবীর আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে মানবসভ্যতার অগ্রগতিও ঘটে চলেছে। যার ফলস্বরূপ পরিবেশের ক্ষতি ক্রমবর্ধমান। উন্নত বা উন্নতশীল কোন দেশের পক্ষেই এই ক্ষতি এখনও রোধ করা সম্ভব হয়নি।

ক্রমাগত বায়ুদ্ষণের ফলে অতি সুক্ষ ও অদৃশ্য দূষিত কনা মানবদেহের ফুসফুসের ক্ষতি সাধন করে। রক্ত সংবহনে ব্যাঘাত ঘটায়। হাঁফানি ও শ্বাসকষ্ট হয়। হাদরোগ, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা ও ফুসফুস ক্যানসারে মৃত্যুর জন্য এই দূষিত কণা একতৃতীয়াংশ দায়ী। এই বায়ুদ্যণের জন্যে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে চলেছে। এছাড়া বায়ুদ্যণের জন্যে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি মানবজগতের ক্ষতি ঘটাচ্ছে। বিশ্বের উষ্ণায়ন ঘটেই যাচ্ছে।

সম্প্রতি ঘটে চলা করোনা ভাইরাস অতিমারির জন্য বিশ্ব জুড়ে দীর্ঘ লকডাউন পর্বে কলকারখানা ও পরিবহন বন্ধ থাকার ফলে আকাশ বাতাস নির্মল ও শুদ্ধ হচ্ছিল। বিশেষজ্ঞরা আশার আলো দেখাচ্ছিলেন। এই দৃষণের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরেও যা সম্ভব হয়নি তা লকডাউনের প্রভাবে সম্ভব হয়েছে। জীবজন্তু, পশুপক্ষী সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

তবে লকডাউন পর্ব কাটলে মানবজাতি যদি সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে না পারে তাহলে সমুদ্রের জলের উত্তাপ বাড়বে, হিমবাহ গলতে শুরু করবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রোগ জ্বালার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাই থাকছে।

এই বায়ুদ্ষণের হাত থেকে ওজোন স্তর কে রক্ষার জন্য ১৬ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব জুড়ে ওজোন দিবস পালিত হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রপুঞ্জ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য করোনা কালের পূর্বে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠকে 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অব ক্লিন এয়ার ফর ব্লু ক্ষাইজ' পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ নীল আকাশের জন্য নির্মল বাতাসের প্রয়োজন। তার জন্য প্রতি বছর ৭ই সেপ্টেম্বর দিনটি বাছা হয়। যেহেতু এই বছর ৭ই সেপ্টেম্বরের দিনটি প্রথমবার পালিত হবে, তাই ব্যাক্তিগত থেকে সরকারি প্রত্যেকটি স্তরের মাধ্যমে বায়ুদ্যণের ক্ষতি ও দিনটির গুরুত্ব সকলকে বুঝিয়ে জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধির দ্বারা একযোগে এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

# সীমান্ত

# সুভাশীষ মণ্ডল চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ (স্লাতকোত্তর) शिःला थाना মহाविদ्यालय

কেন্দ্রীয় চরিত্র সীমাকে কেন্দ্র করে আমার এই কাহিনি। অর্ধাহার ও অনাহার <mark>যার নিত্যসঙ্গী। বাড়িতে পঙ্গু</mark> বাবা ও মা। আর আছে এক ছোট ভাই যে ক্লাস নাইনে পড়ছে। বিষয়সম্পত্তি তেমন কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর যার বেশিরভাগ অংশ আবার সীমার সহায়সম্বলহীন হতদরিদ্র পঙ্গু বাবা নিবারণের মতো <mark>জরাজীর্ণ। দারিদ্রতা যে নিবারণের কোনো বারণই শোনে না। সীমার ভাই পল্টু মেধাবী</mark> ছাত্র। সর্বদাই স্কুলে ফার্স্ট হয় সে। ক্লাসে তার জুড়িমেলা ভার। একদিন স্কুলে তাকে গণিতের শিক্ষক উদাত চিত্তে প্রশ্ন করলেন।

"পল্টু, তোমার বাড়ির source of income কী? " পল্ট হাসি মুখে উত্তর দিলো...

"স্যার... আমার মা..."

"আর তোমাকে লেখাপডা কে শেখায়?"

"স্যার... আমার দিদিভাই..."

সীমার মা সারাদিন অপরের বাডিতে কাজ করে কোনরকমে সংসার চালান। সত্যি একজন সহায়-সম্বলহীন নারীর পক্ষে সংসার চালানো যে কতটা কষ্টকর তা সুনয়না <mark>দেবীর চেহারায় ফুটে উঠেছে। সীমার ভাইয়ের মতো সীমাও খুবই মেধাবী ছাত্রী।</mark> উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পড়াশোনা আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি সে। বাডির বড মেয়ে তো তাই সে মায়ের কষ্টটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মাকে সাহায্য করে সে এখন। তাছাড়া স্বার্থ পূরণ করতে হলেও তো একটা সামর্থ্যর প্রয়োজন যা সীমার পরিবারের ছিল না। তাই বিদ্যা দিয়ে মস্তিষ্ক ভরানোর কথা না ভেবে কষ্ট ভরা মায়ের বুকটিকে হালকা করার কথা ভাবে সে। সীমা বাড়ির পাশে এক ব্যবসায়ীর ছেলেকে প্রাইভেটে ইংরেজি পড়ায়। মাসে হাজার টাকা করে পায়। সীমার মা সুনয়না দেবী <mark>সেই বাড়িতে ধোয়া-মোছার কাজ করেন। সীমা তার ছাত্রীর খাতায় স্বাক্ষর করার সময়</mark> বাড়ির দেয়াল গুলোর দিকে প্রায়শই তাকায় । তার চোখ পড়ে যায় বাড়ির দেয়ালগুলোতে তার মায়ের হাতের আলতো স্পর্শ। সুনয়না দেবীর সুনয়ন যে বাড়িতে পড়েছে তার তো একটা আলাদা রূপ থাকবেই। সীমা লজ্জা না পেয়ে বরং এটা ভেবে গর্ববোধ করতে শুরু <mark>করলো। ভেজা চোখে সীমা তার ছাত্রীর খাতায় স্বাক্ষর করলো যা তার কাছে স্বর্ণাক্ষর এর</mark> মতো মনে হলো।

এদিকে প্রতিবেশী লোকেরা সীমার বয়স নিয়ে নানা কটাক্ষ করতে শুরু করলো। সীমার মাকে উঠতে-বসতে শুনতে হয় মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে। কারণ গরিবের বাড়িতে মেয়েদের বয়স যে ঘড়ির সেকেন্ডের কাটার মত করে ঘুরতে থাকে। কাঠের মত এত রোগা চেহারা ওর। উচ্চতা দেখে কেউ কেউ তাকে ঢেঙ্গি বলে ডাকে। গায়ের রংটাও বাড়ির অর্থনীতির মতো উজ্জ্বল নয়। যেখান থেকেই পাত্র আছে কোন পাত্রেরই সীমাকে পছন্দ হয় না। ভাল পন দিতে পারলে হয়তো টাকার জোরে মেয়েটার বিয়ে হয়ে যেত আজ। সীমার যে পোড়া কপাল। সীমাকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে সীমার মাও যেন নিবারণের মতো ক্রমশ অসাড হয়ে যেতে লাগলো।

সীমাকে যেনো এই বাড়ির ত্রিসীমানায় বাইরে না বের করতে পারলে এই বাড়ির ফাঁড়া যেন কোন মতেই কাটবে না । কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুনয়না দেবী দরিদ্রতার চাপ না সামলাতে পেরে মাঝেমধ্যে সীমাকে গালমন্দ করেন।

" তুই কি আমাকে শান্তি দিবি না মুখপুড়ি? আমি অনেকের বাড়িতে ধুলো ময়লা সাফ করেছি কিন্তু তোর মতো জঞ্জাল সাফ করার মতো সামর্থ্য নেই রে মুখপুড়ি আমার...! মরতে পারিস না তুই! "

নিজের প্রতি ক্ষোভে-দুঃখে অভিমানী সীমা বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেল। এতে ওরই বা কি করার আছে। এমতাবস্থায় প্রলয় নামের এক যুবক এসে সীমাকে প্রণয় প্রস্তাব দেয়। সীমা যেন তার সীমানায় একটা শক্ত খুঁটি দেখতে পেল যা ধরে সীমা এ যাত্রায় উদ্ধার হয়ে যাবে ভাবতে শুরু করলো। প্রলয় ছোটবেলা থেকেই বাবা মা হারা। আত্মীয় স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছেন একজন কাকা তিনিও আবার প্রলয়-এর প্রতি উদাসীন। সীমার বাড়ির মতনই ছোট্ট একটি বাড়িতে প্রলয়ের বাস।

প্রলয় যেদিন সীমার বাড়িতে এসে বিবাহ প্রস্তাব দিল সুনয়না দেবী এটা ওটা না ভেবে রাজি হয়ে গেলেন। এই অভাগিনীর জীবনে যেন প্রলয় তার প্রলয়ে সীমার জীবনে সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে দিলো। সীমা আর প্রলয়ের বিয়ে হল।

সীমা যেন তার ভাগ্য ফিরে পেল। কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্যের পরিহাস' সীমার সীমানায় সুখকে থাকতে দিল না বেশিদিন। এক দুর্ঘটনায় প্রলয় আজ আর নেই। এক বছর পর সীমার মতনই দেখতে সীমার এক কন্যা সন্তান হলো। সীমার দুঃখ যেন কোনো সীমাই মানছে না। প্রলয় মারা গিয়ে তার জীবনে যেন আবার এক নতুন প্রলয় সৃষ্টি করে গেল। বাচ্চা কোলে নিয়ে বাপের বাড়িতেও আসার মত পরিস্থিতি ও যে নেই তার। ছয় মাস আগে সীমার বাবাও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সুনয়না দেবী অসাড় হয়ে গিয়েছেন।

এদিকে ভাই পল্টু উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। সীমা স্বামীর ওই সামান্য ভিটেটুকু বিক্রি করে বাপের বাড়িতে এসেই ঠাঁই নিয়েছে। ভিটে বিক্রির টাকায় পল্টুকে সে ভালো একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করেছে। কারণ সে যে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে সে তার ভাইকে সেই পরিস্থিতির সামনে আনতে চায় না। তার মতনই তার ভাইয়ের ভাগ্য হোক সে এটা কোন মতেই চায়না।

সংসারের চাপ সামলাতে না পেরে সীমা মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্রমাগত দুর্বল হয়ে যেতে লাগল। নতুন কাজের সন্ধানে বের হওয়ার মতো শক্তিটুকুও যে আজ আর তার নেই। কিন্তু সংসার তো আর অভাব শোনে না। বেরোতে যে তাকে আজ হবেই। সীমা দুর্বল শরীর নিয়ে পথ চলতে শুরু করল। ক্ষীণ পা দুটি তার শরীরের ভার নিতে সক্ষম হলো না। বসে পড়লো রাস্তার পাশে এসে। চোখে-মুখে ক্লান্তির আভা স্পষ্ট। সীমা তার অভিমুখে দেখল এক পতিতালয়। সীমা মুখে এক অসহ্য হাসি নিয়ে বলতে শুরু করল...

" এই পতিতালয় তো সুন্দরী মেয়েদের জন্য... আমি তো এরও উপযুক্ত নই! দেহ ব্যবসা করার মত দেহ ভগবান তো আমাকে দেয়নি... আমি যে এখানেও মানানসই নই, কি অর্থ বেঁচে থাকার!"

সীমা আজ আর কাজের সন্ধানে গেল না। একরাশ ভাবনা নিয়ে সীমা বাড়ি ফিরল সেদিনকার মত। বাড়ি ফিরে এসে দেখল ভাই পল্টু হোস্টেল থেকে বাড়ি ফিরেছে সবে। তার হাতে রয়েছে একটি কাগজের মোড়ক। সীমা ভাই পল্টু কে জিজ্ঞাসা করল,
"কি রে, তুই এখন হোস্টেলে থেকে?"

"দিদি তোর জন্য একটা সুখবর আছে।"

<mark>"আমার মত অভাগিনির জন্য</mark> আবার কি সুখবর রে?"

<mark>"এই কাগজটি পড়লে তুই সব বুঝতে পারবি।"</mark>

"আরে এত ছোট গল্প লেখার প্রতিযোগিতা..."

"এটা সর্বসাধারণের জন্য। আমি তোর নাম লিখে দিয়েছি। প্রথম যে হবে তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।"

<mark>"না ভাই, তুই আমায় ক্ষমা কর। আমার</mark> দ্বারা এসব কিছু হবে না..."

"না দিদি তোকে লিখতেই হবে! বড় আশা করে এসেছি রে..."

"কিন্তু আমি কি..."

" তোর দ্বারাই হবে। তাছাড়া তোর লেখা গল্প আমি অনেকদিন পড়িনি..."

ভাইয়ের আবদার রাখতে গিয়ে সীমা কলম ধরল। স্কুলছুট বালকের মতো সে লিখতে শুরু করলো। কিন্তু কি লিখবে সে? সেরকম কোনো বিষয়বস্তু না পেয়ে সে নিজের জীবনের এলোমেলো গল্পটিকেই সাজাতে শুরু করলো। মাথাও ধরেছে খুব। সেদিন সে সারা রাত্রি জেগে লিখলো। কলম ধরার ক্ষমতাটুকুও যেন তার নেই আর। নিজের জীবনের গল্প বলতে বলতে কাগজটি তার ভিজে গেল। সরস্বতী স্বয়ং এসে সীমার কলম ধরলেন। সীমার গল্প শেষ হল।

ভাই পল্টু দিদির লেখা আত্মজীবনী খুশি মনেই স্কুলে জমা দিল।

পনেরো দিন পর ফল প্রকাশ হলো। ভাই পল্টু বাড়ি ফিরে এসে দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলল... "আরে আমার দিদির জায়গা নেওয়ার ক্ষমতা আছে নাকি কারো আবার! দিদি তুই ফার্স্ট হয়েছিস। কাল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।"

পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার পেল সীমা। বেজায় খুশি তার পরিবার। প্রচুর প্রশংসা কুড়াল সীমার লেখা ছোটগল্প "সীমান্ত"। সীমা যেন তার দুঃখের সীমান্ত পেরিয়ে পাঠকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। জরাজীর্ণ অভাগিনী এই কুৎসিত মেয়েটি যেন পাঠকদের সাহিত্যচর্চার একমাত্র আধার। সীমা আজ আর কেবল তার সীমানায় নেই সে যে সীমান্ত পেরিয়ে দূর আকাশে কিরণ দিচ্ছে।

## সত্যিই বিশায়কর

#### সুমন বেরা

দ্বিতীয় সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

একুশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সমগ্র সমাজ পূর্ণ পুঁজিবাদীতে; গরীবের হাহাকার দমে যাচ্ছে শিল্পপতিদের জঘন্য কারসাজিতে। কিরূপ এই ছলনার দরুন প্রতারিত হচ্ছে সাধারন মানুষ। সময় গিয়েছে থমকে আজ: জীবন পাতলা কাগজের ফানুস। ছোট্ট ছোট্ট আশা প্রত্যাশায় এক একটি দিন যাচ্ছে কেটে; গরীবরা বসেছে পথে। দুমঠো আনন্দের দরুন চলে অনশনের কর্মসূচি; এই প্রাণপন চেষ্টার ফল অবহেলিত শূকররূপী। কর্ম সন্ধানে বেরিয়ে পিতা মনমরা হয়ে ফেরে; বিলাসিতা দেয় ছেড়ে।

তালপাতার ছাউনিতে জীবনভর কাটে; প্রলয়ের শিকার তারাই হয় যারা এরূপ ভাবে বাঁচে। চারজনের পরিবারে নিজেরা না খেয়ে থাকে; ছেলেমেয়েদের মুখে একগুচ্ছ হাসি ফোটানোর তরে। বিলাসিতা যাদের রাজকীয় মর্যাদা, ঠকানো যাদের পেশা, কষ্টের দর্শন করে না তারা, পায় না একটুকুও সাজা। যত বেদনা গরিবের কেন, হে ঈশ্বর! দাও আমায় বলে! প্রত্যেক গরিবের কর্মফল যেন ফলে তালপাতার ওই ছাউনির ডালে। প্রত্যেক জীবকে বানাও সমান, এই প্রার্থনাই করি, সবাই যেন চালাতে পারে বিধ্বংসী ঝড়ের মাঝেও তরী।

## যুগের হাওয়া

সুমন বেরা

দ্বিতীয় সেমেস্টার সংস্কৃত বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

ক্রমশ বদলে যাচ্ছে যুগ পাল্টাচ্ছে দিন দিন... বইছে হাওয়া উল্টো দিকে সংস্কৃতি বিহীন। এ যুগেতে নামে না বৃষ্টি কান্না ভেজা রাতে; আসে না বসত্ত আপন ইচ্ছায়, কিংবা কোকিলের ডাকে। হারিয়ে যাচ্ছে জনজীবন কঠিন ব্যস্ততার ভিড়ে; সময়ের কদর থাকছে না, পাশের বাড়ির তরে। কাঁচা বাড়ি আজ নিশ্চিহ্ন স্থূপ পর্বতের তলে; মোঘল আমলের দেয়াল ঘড়িটাও স্মৃতি সৌধের দলে। কলকারখানার ধোঁয়ায় কমছে অক্সিজেনের দাম, ভুলছে মানুষ এই অবস্থার কি ভয়ানক পরিনাম! কালকের সেই সঙ্গী শহর, আজ ব্যস্ত নগরী; ব্যস্ততার জাঁতাকলে মোবাইল ফোন প্রহরী। চিরনিদ্রায় যাচ্ছে সময় भागावि जापूत स्भार्त, পুরোনো স্মৃতি ভুলতে नजून वालांक रार्स।

## বন্ধুর খোঁজে

সৌরভ দাস

দ্বিতীয় সেমেস্টার দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আমি মনের অন্ধকার গলিতে পথ চলি, একাকী আমি একা একা কথা বলি, কেউ নেই আমার কথা শুনবার, আমাকে আমার মতো করে বুঝবার। আমি পথ হাঁটি, বিশ্রাম খুঁজি, আর হাঁপিয়ে উঠি। আমার অব্যক্ত কথা হৃদয়ে ঝড় তুলে করে ছোটাছুটি। আমি ভিড় ঠেলে চলি, চারিদিকে কত আনাগোনা। তবুও আমার একাকীত্বের অভিশাপ ঘুচে না। আমার বুকে বাড়ে অব্যক্ত ভাষার যন্ত্রণা। চাই না নিছক সহানুভূতি আর নিছক সান্ত্বনা। वािम तक्रुशैन नरे, तक्रुष् शैन, আমি বন্ধুত্ব খুঁজে চলি সারাদিন। কতশত পরিচয়, তবুও আমি একা, শুধু একা। কন্টাক্ট লিস্টে ট্রাফিক জ্যাম, কানেকশন তবু ফাঁকা। হে পৃথিবী, তুমি ভেবেছো একটি একটি তরে, আমি আছি তবু নেই, তোমার অগাধ মানুষের ভিড়ে।

## এगिरा याउ

#### গোপাল বেরা

দ্বিতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (স্নাতকোত্তর) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

পথ দুর্গম, সামনে বিপদ-পথের প্রতিটি পদক্ষেপই, ঠিকমতো ফেলতে হবে। কিন্তু আজ সামনের দিকে এগোতে হবে. না এগোলে কালকের দিন সুন্দর হবে কি করে! আজ মানব প্রজাতি লড়াই করছে অস্তিত্বের জন্য। স্তব্ধ যাত্রা, কারাগারে বন্দি প্রাণ-কিন্তু থেমে থাকলে চলবে না। লড়াইয়ের নেতৃত্বে ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, বিজ্ঞানী সামনের দিকে পথ দেখাচ্ছে সাহসের সাথে। পথের প্রতিটি মুহূর্তে ইন্ধন যোগাচ্ছে চাষী ভাই, যাতে আমরা দুর্বল হয়ে না পড়ি। এদের স্বাই আমাদের কাছে সম্মানের, শ্রদ্ধার। সবাই ফিরে পাবো সেই আগের সময়-এই আশা সবার মনে, আর ভাল লাগে না এভাবে থাকতে। विशत्य यां विश्व विश्व यां विश्व সচেতন হও, সচেতন করাও! আমরা মান্ষ, আমরা জিতবই।



#### পরিযায়ী

#### গোপাল বেরা

দ্বিতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ (স্নাতকোত্তর)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

গুজরাটের এক স্টেশনে করোনা পরিস্থিতিতে তীব্র আতঙ্কের মধ্যে একসাথে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। এরা সবাই পরিযায়ী শ্রমিক। যে যার নিজের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। আজ এরা প্রত্যেকেই কাজ হারা। এই শমিকদের দলে ছিল এক মহিলা সঙ্গে দুই বছরের সন্তান। একটা পুটলি কাঁধে করে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে স্টেশনে এসেছে। শ্রমিকরা সবাই বাড়ি ফেরার জন্য মরিয়া, ভিড় বাড়তে লাগলো, পুলিশ ভিড় জনতাকে দেখে লাঠিচার্জ করছে, আর চিৎকার করে বলছে, "সবাই সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন মাক্স স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন"। শ্রমিক মহিলাটি কথাগুলো শুনছিল, স্যানিটাইজার কথাটি সে এই প্রথম শুনল। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন স্টেশনে দাঁড়ালো, মহিলাটি তার সন্তানকে নিয়ে বিহার যাওয়ার ট্রেনে উঠল। তিন চার দিনের পথ কিন্তু সঙ্গে খাওয়ার কিছু ছিল না। লকডাউন এর প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টাকা সব ফুরিয়েছে। অনেক কন্তে একটা বিস্কুটের প্যাকেট জোগাড় করে রেখেছিল সে।

ট্রেন গন্তব্যের দিকে রওনা দিল, শ্রমিক মহিলাটি তার সন্তানকে কোলে নিয়ে ট্রেনের জানালার পাশে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল- কয়েকদিন আগে তো সব ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু এরমধ্যে কি যে হল ঠিক বুঝতে পারছে না, বাড়ি গিয়ে কিভাবে সংসার চালাবে সে চিন্তাও ঘুরপাক খাচ্ছিল। আজ যেন সে অজানা পথের পথিক। ট্রেন সময়ের সাথে তার গন্তব্যের দিকে আপন গতিতে ছুটতে লাগলো, দিন হয় রাত হয় কিন্তু এদিকে ট্রেনে পর্যাপ্ত খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। খিদের জ্বালায় শ্রমিকরা সব ছটফট করছে। মহিলাটিরও ঠিক তেমন অবস্থা। এমনকি পর্যাপ্ত জলও নেই। মহিলাটি পুঁটলিতে বাঁধা বিস্কুট প্যাকেট বের করেছে খাওয়ার জন্য। হঠাৎ তার কোলের বাচ্চাটি চিৎকার করে কান্না শুরুক করল, মা সন্তানের কান্না শুনে কোলে দুলাতে দুলাতে বলল, "খুব খিদে পেয়েছে না বাবা, এই নে বিস্কুট খা" বলে নিজের মুখের কাছে আনা বিস্কুট বাচ্চার মুখে দিয়ে দেয়। সে আজ কয়েকদিন কিছুই খায়নি, ট্রেনে কোন ব্যবস্থা নেই। তাই সে ভাবল বিহারে পৌঁছেই কোন না কোন ব্যবস্থা করা যাবে।

এদিকে যাত্রীদের ট্রেনের যাত্রা সময়ের সাথে বিষম হয়ে উঠেছে । একদিকে করোনা আতঙ্ক অন্যদিকে খাবার সংকট শ্রমিকদের জাপটে ধরেছে। মহিলাটি পাশাপাশি খাওয়ার সাহায্য চাইল কিন্তু বাকিদেরও অবস্থা একই। সময়ের সাথে সাথে তার গলাটি যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরটা কেমন ঝিমিয়ে যাচ্ছে, হাত-পা কাঁপছে।

রাতের ট্রেন আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কালকেই বিহার পোঁছে যাবে। রাতের শিতল হাওয়ায় মহিলাটি জানালার পাশে মুখ রেখে শুয়ে আছে। রাত কেটে ভোর হল,বিকেলেই স্টেশনে পোঁছাবে। সে কিন্তু আর চোখ খুলল না। পাশাপাশি সবাই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বুঝতে পারল সে আর নেই। তার কোলের বাচ্চাটি তার পাশে বসে খেলা করছে। করোনা আতঙ্কে কারুর সাহস হয়নি গায়ে হাত দিয়ে দেখার।

ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছালো। সবাই এক এক করে নেমে পড়ল। সিআরপিএফ ট্রেন থেকে মৃত দেহটি এনে প্লাটফর্মে রাখল। বাচ্চাটিও সেখানে ছিল। প্ল্যাটফর্মে মৃত দেহটি অনেকক্ষণ পড়ে রইলো। বাচ্চাটি তার মাকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে হাত দিয়ে ডাকতে লাগল। ডাক না শোনায় টলমল পায়ে একটু এগিয়ে আবার পিছনে এসে ডাকতে লাগলো। সে জানে না তার মা তার ডাকে আর কোনদিন সাড়া দেবে না। বাচ্চাটির সামনে এক অজানা পথ, সে আজ অজানা বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে। সারা দেশেরও ঐ একই অবস্থা।

## কাৰ্গিল ১৯

#### সুমন্ত বেরা

চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সান্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

2

মাতলা নদীর পাশে রয়েছে একটি গাঁ, গাঁয়ের নাম দিগন্তগঞ্জ। নামের সাথে মিল আছে বইকি, আর না আছে সেই গাঁ-এর শেষ, না আছে শুরু। আর কারই বা শেষ আর শুরু নিয়ে মাথা ব্যাথা। এতো বড়ো গাঁ-এ থাকে মাত্র কয়েকজন। যে-যার মতো দু'বেলার খোরাক জোগাড় করতে ব্যস্ত। সত্যি বলতে কি এখানকার মানুষগুলো দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তাদের আবার নাম নিয়ে চর্চা!

হঠাৎ-ই বাড়ির বাইরে থেকে রজত-এর বাবা ডাক দেয়,

- "সাবিত্রী, তাড়াতাড়ি বাইরে এসো, দেখো কি এনেছি!"
- "কি এনেছো গো ?"
- "দেখোই না! পদ্মার ইলিশ! মনে হয় আমাদের খোঁজে এসেছিল।"
- "তুমি যে কি বল না! তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে, খই রাখা আছে খেয়ে নাও।"

দেশভাগের পর ভিটেমাটি ত্যাগ করে সুবীর-বাবু দুই ছেলে আর বৌকে নিয়ে এখানে এসে ওঠে। কোনো রকম কষ্টেস্ষ্টে দিন কাটে। তারাই বা কি করবে। প্রতি বছর বন্যায় সব 'মাতলা'-র গর্ভে চলে যায়। তাদের ছেলে রজত আর অনীক দুজনেই গ্রামের পাঠশালায় পড়ে। দুজনে একসাথে যায় আর একসাথেই ফিরে আসে। বাড়ি নিয়ে এসে দুজনেই কী খুশি! অনেক দিন তারা ইলিশ খায়নি।

রজত বলে, "মা খেতে দাও! খিদে পাচ্ছে।"

মা বলে, "বাবা হাত-মুখ ধুয়ে বস্, দিচ্ছি!"

কিন্তু মা তো জানে যে, বাড়িতে খাবার নেই। কিন্তু ছেলেরা যাতে বুঝতে না পারে সেইজন্য মা পার্বতী-র বাড়ি থেকে দু-মুঠো মুড়ি ধার করে এনে দুই ছেলেকে দেয়। এইভাবে কষ্টে তাদের দিন কাটে। মা-তো এই আশায় কতদিন পেট ভরে খায়নি তার হিসাব নেই। মা ভাবে যে দুটো ছেলে বড়ো হয়ে চাকরি করলে তখন না হয় পেট ভরে খাবে।

2

দেখতে দেখতে রজত ও অনীক বড়ো হয়ে উঠে। অনীক এখনও পড়াশুনা শেষ করেনি, কিন্তু রজত যেহেতু বড়ো তাই তাই উপর সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে। তাই রজত অল্প বয়সে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়।

ইনকামের সাথে সাথে খরচও এখন অনেক বেড়েছে। বাবার শরীরটা খারাপ আর ভাইয়ের জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়। কিন্তু বাড়ির অবস্থা আগের থেকে সচ্ছল। এখন তাদেরকে আর অনাহারে দিন কাটাতে হয় না।

রজতের মা রজতের বাবাকে বলে, "ছেলেটা বড়ো হয়েছে, বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে তো? আর তুমি তো বাবা, তোমার তো দেখছি কোনো হেল দোল নেই।"

- "কবে আর আমাকে বাবার জায়গাটা দিয়েছো! ছোটোবেলা থেকেই তো তুমি ওদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব নিয়েছ। কোনদিন কোন জিনিস কি আমাকে বুঝতে দিয়েছ? ঠিক আছে রজত এবারের ছুটিতে বাড়ি এলে ওকে না হয় বলব।" কিছুদিন পরেই ছুটিতে রজত বাড়ি আসে।
- মা বলে, "বাবা আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছিস, ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া করিস নি। ওখানে তোর খেয়ালই বা কে রাখবে!"
- "তুমি যে কি বল না মা! ওখানে নিজের খেয়াল নিজেকেই রাখতে হয়।"
- "তুই যে কি বলিস না বাপু! নিজের খেয়াল আবার নিজে কেউ রাখতে পারে নাকি! ওসব কথা বাদ দে। তুই বাইরে থেকে এসেছিস, এখন তাড়াতাড়ি স্নান করে নে। আমি ভাত বাড়ি।"
- "তাই বরং করো। আমি চট করে স্নান করে আসি।"
  স্নান সেরে রাজত খেতে বসেছে, আর তখনই রজতেয় মা রজতের বাবাকে খোঁচা মেরে
  বলে, "বলো না সে ব্যাপারটা!"
- "কেন তুমি বলতে পারছো না?"
- "কী ব্যাপার মা?"
- "আরে বাবা, আমরা তো আর সারা জীবন থাকবো না, তাই ভাবছি এবার তোর বিয়েটা নিয়ে…"
- "মা, তোমরা যে কি বল না! ওসব আমায় দ্বারা হবে না।" রাজতের বাবা বলে, "হবে না বললে কি হবে? আমরা চলে গেলে তোকে দেখবে কে?" রজত খেয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল, কিন্তু লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারল না।

#### 9

কিছুদিন পর দূর গাঁয়ের এক মেয়ের সাথে রজতের বিয়ে ঠিক হল। মেয়েটির নাম কমলা, যেমনি সুন্দর দেখতে তেমনি তার ব্যবহার। একাই বাড়ির সব খেয়াল রাখে। কিছুদিন পর রেজিমেন্ট থেকে ডাক আসে যে, তাকে এবার যেতে হবে। রজত সরাসরি তার মাকে না বলে তার স্ত্রীকে বলল যে, 'আমায় কাল সকালে যেতে হবে।"

- "যেতেই হবে ? আর কয়েকদিন থেকে গেলে হত না?"
- "না, আর মাকে এখনি বলার দরকার নেই, কাল বলবে।"

পরেরদিন সকালে নয়ন-জলে মা ও স্ত্রী বিদায় জানায়, আর বাবা তো কাঁদতে পারেনা, তাই হয়তো বারান্দায় এক কোনে বসে আনমনা হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েকমাস পর রজতের ছেলে হয় । আর রজতের বাবা ছেলেকে এই সংবাদ চিঠি লিখে জানিয়ে দেন। আনেকদিন পর রজত বাড়ি ফিরে আসে, এসে দেখে তার ছেলেটা বড় হয়ে গেছে । ছেলেকে দেখে রজত মনে মনে ভাবে যে, ছেলেকে শিক্ষক করবে। এইভাবেই কিছুদিন পর রজত আবার ফিরে যায়। এবার বোধহয় তাকে যেতে না দেওয়ায় দলে ছেলেও সামিল হয়। কিন্তু তাকে যে যেতেই হবে।

রজত মনে মনে ভাবে এ জন্মে ভারত-মাতার ঋণ শোধ করবো আর পর জন্মে তোমার। হঠাৎ-ই কমান্ডিং অফিস থেকে নির্দেশ আসে যে, কার্গিলের চূড়ায় পেট্রোলিং-এ যেতে হবে। তাতে রজতের নামও সামিল থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই রজত ও তার তিন বন্ধু কার্গিলের চূড়ায় পোঁছায় এবং অনুপ্রবেশকারী চার পাকিস্তানি সেনা তাদের বন্দি বানায়। এবার যে কাজটি করে, তা যুদ্ধ বিরোধী। তারা ওই চার ভারতীয় সেনার দেহকে ছিন্নভিন্ন করে বস্তা বন্দি করে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেয়।

8

হঠাৎ-ই একদিন খবর আসে তাদের ছেলে কার্গিলের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। রজতের বাবা বুঝতে পারছে না যে, সে কি ভাবে রজতের মাকে তার ছেলের মৃত্যুর সংবাদটি দেবে।

দূর থেকে তার বৌমা প্রশ্ন করে, "বাবা কার ফোন?" বাবা ধরা গলায় বলে, "হেড কোয়ার্টার থেকে।"

- "কি খবর বাবা?"
- "আমার ছেলে, আমার ছেলে রজত কার্গিলের যুঙ্গে শহীদ।" সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে। যে বাবা এতোদিন ছেলের আসা-যাওয়া দেখেছে, সে বাবা ছেলের মৃত্যু সংবাদ শুনে আর স্থির থাকতে পারল না। আর রাজতের মা ও স্ত্রী যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছে। রজতের মা পথের দিকে চেয়ে রইল, হয়তো সব সংবাদ মিথ্যে করে তার ছেলে আবার তার কোলে ফিরে আসবে।

তার ছেলে ফিরে এল, তবে পায়ে হেঁটে নয়, বরং বাক্স বিদ্দ হয়ে। ছেলের ছিন্নভিন্ন শরীরটাকে দেখে মায়ের চোখে জল ভরে উঠল। তারপর নিজেকে শক্ত করে এক অফিসারকে প্রশ্ন করল, "আপনারা তো ভর্তির সময় এক ইঞ্চিও কম নেন না ? তাহলে আমি কেন আমার ছেলের ছিন্নভিন্ন শরীর নেব?" এরপর তার শহীদ ছেলের পেছন পেছন আসে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা। তাদের কত সব প্রতিশ্রুতি আর প্রতিবেশীদের অভিনয় ভরা চোখের জল, আয় সামান্য কিছু অর্থ। অর্থ কি পারে একটি মায়ের বুকের সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে? নাকি পারবে একজন স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর ফিরিয়ে দিতে? নাকি পারবে একটি সন্তানকে তার বাবা ফিরিয়ে দিতে? এমনকি প্রতিশ্রুতির মধ্যেও থাকে রাজনীতি। আমরা কি তারপর সেই পরিবারের কোনো খবর রাখি? এমনকি যে সংবাদ মাধ্যম এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তারাও বুঝি অদৃশ্য বাতাসে বিলীন হয়ে যায়। আর বোধহয় সে মা আজও খোকার ফিরে আসার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে দিন কাটায়।

#### শেষ আলাপ

#### কার্তিক হাজরা

চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সান্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

2

পিচের সড়ক বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখানেই রয়েছে একটি গুদাম ঘর। আর তারই পাশে রয়েছে একটি কলেজ। ওই গুদাম ঘরে নাকি সব চোরাই মালের আনাগোনা। তারপর জিনিসগুলো কোথায় যায় তা বোধহয় সবারই অজানা। আর সে গুদাম ঘরটির দিকে তাকালে বিমর্ষ সভ্যতার মুখ মনে পড়ে। ছোট ছেলেটার চাউনি যেন কেমন উগ্র প্রকৃতির, চেহারাটি ছিপছিপে, গায়ের রং কালো, দেখলেই কেমন যেন ঘৃণা হয়। পরে নিখিলের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানলাম, ওর নাম নাকি বিজয়, ভিখারীর নাম নাকি বি-জ-য়-। ওর নাকি মা, বাপ কেউ নেই। বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালী। সেখান থেকেই ওর কাকা এখানে রেখে গেছে।

- চল দাদা কাজে লেগে পড়, আজ কি জানি কোথা থেকে দুটো বাইক এসেছে আর বাবু বলে দিয়েছে কালকের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই।
- ওদের কথা বাদ দে না, ওরা তো বলেই খালাস। আর তোর বাবুকে বলে দিবি আগের মাসের দুশো টাকা বাকি আছে। না দিলে এই বিশু ভাইয়ের ক্ষমতা ওরা জানে না। টাকার জন্য এই বিশু সব কিছু করতে পারে।

কাজ শেষে বিজয় গুদামে রান্না করে খায় আর তারই এক কোণে ঘুমায়, এই ভাবেই তার দিন কাটে।

2

একদিন হঠাৎ বিশুদার মুখে বিজয়ের নামে ভালো ভালো কথা শুনলাম, তখনই আমার মনে গভীর সংশয় তৈরি হয়েছিল, আর সেটাই সত্যি হল। কয়েকদিন ধরে বিজয় আর কাজে আসছে না। কোথায় যে গেল! এটা ভাবতে ভাবতেই হাতুড়ির ঘা-টা হাতের ওপর পড়তেই যেন সমস্ত ভাবনার অবসান ঘটল। আর এতো ভেবেই বা কি হবে? কেউ তো হয় না আমার! তবুও কষ্ট হয় অমন বাপ-মা মরা ছেলেটা! একদিন হঠাৎই কলেজের পাশে চা দোকানে বিজয়ের সাথে দেখা।

- আমি বললাম কিরে এখানে বসে? কাজে আসিস নি বহুদিন, কি করিস এখন ?
- তোমায় কেন বলতে হবে?
- এখন তুই অনেক বদলে গেছিস! কথাবার্তা, চলাফেরা, এমনকি পোশাকেও।
- কিছু উত্তর না দিয়ে হাতে একটা সিগারেট নিয়ে টানতে লাগল ।

পরে গুদামের একটি ছেলের কাছ থেকে জানতে পারলাম, ও নাকি বিশুদার দলে নাম লিখিয়েছে। আর এখন নাকি বিজয় ছোটোখাটো ধমকানি, পকেটমার এইসব কাজ করে। কি জানি কি হবে বিজয়টার ?

হঠাৎ-ই একদিন শুনি কে যেন বিশুদাকে খুন করে দিয়েছে। শুনে মনে মনে একটু খুশি হলাম। এবার হয়তো বিজয় দল ছেড়ে ভালো কোনো কাজ করবে। কিন্তু হল তার উল্টো। শুনি বিজয় বিশুদার খুনিকে মারা জন্য রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমার তো ভয় আরো বাড়ল, পাছে বিজয়ের কিছু না হয়ে যায়। আমার বয়স হয়েছে, ভাবি এবার শুদামের কাজ ছেডে দিই।

হঠাৎ-ই কলেজে যাওয়ার পথে রমার চোখের সামনে একটা খুন হয়ে যায়। কিন্তু সে কাউকে বলেনি, পাছে তাকে ঝামেলায় পড়তে হয়! রমার বাড়ি থেকে কলেজের দূরত্ব মোটামুটি একমাইল। তাই রমা পায়ে হেঁটেই কলেজে যায়।

<mark>একদিন রমা কলেজে যাওয়ার</mark> পথে পাশের চা দোকানে বিজয়কে দেখে ডেকে বলে, - এই তুমি এইদিকে এসো।

বিজয় ভয়ে ভয়ে তার সামনে এসে বলে, কি হয়েছে ? কারণ, বিজয় জানত যে ঐ মেয়েটি সব জানে। রমা বলে,

- তুমি আজ বিকেলে মন্দিরের সামনে দেখা করবে। রীতিমতো বিকেলে বিজয় সেখানে যায়, আর গিয়ে দেখে রমা তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। বিজয় ভয়ে ভয়ে রমার কাছে যায় আর বলে.
- कि वलत ाण्ंा ।
- কেন, কোনো তাড়া আছে নাকি?
- না, তা নয় কিন্তু অনেক কাজ আছে।
- আজ আবার কাউকে খুন করার কাজ আছে নাকি ?
- বাজে কথা বলো না, কি বলার আছে বলো, আমার তাড়া আছে।
- সেইদিনের ব্যাপারটা কিন্তু তুমি আর আমি জানি। তোমার কাছে নিশ্চয়ই অজানা নয় যে, এর পরিণতি কি হতে পারে।
- তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছ?
- তুমি তা ভাবতে পারো। কিন্তু এবার থেকে প্রতিদিন তোমাকে এখানে আসতে হবে।
- কেন ?
- আমি বললাম তাই।

8

এরপর রীতিমতো বিজয় ও রমা প্রতিদিন সেখানে আসে। রমা জানতে চাইল,

- তোমার বাড়ি কোথায় ?
- আমার বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালী।
- একে একে বিজয় সব ঘটনা রমাকে বলল, কি করে তার এখানে আসা এবং বেড়ে ওঠা। স্বাভাবিক অর্থে বিজয় সমাজটাকে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছে। তার কথায় সমাজ মানে খুন, মারামামি, চুরি, রাহাজানি ইত্যাদি ।
- তুমি এগুলো কেন করো? এর থেকে কি পাও ?
- कि वावात! होका! व्यत्नक होका।
- কোথায় টাকা? কত জমিয়েছো? দেখি! দেখি!

বিজয় খুব অবাক হয়ে রমার দিকে তাকিয়ে থাকে। রমা বলে তুমি আজ থেকে এসব কাজ করবে না।

- তে কি করব ?
- ভালো কোনো কাজ কবে।
- এসব আমায় দ্বারা হবে না।
- তাহলে কাল থেকে আসতে হবে না, যদি না আমার কথা শোনো।

পরের দিন রমা দৃশ্যটা দেখে চমকে গেল। দেখল যে কলেজের পাশের গ্রিলের দোকানে কাজ করছে বিজয়! বিকেলে আবার রমা ও বিজয় মন্দিরের সামনে গাছতলায় বসে আছে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে রমা ও বিজয়ের চোখে এক রং ধরা পড়েছে। এ যেন কোনো এক অন্য রং, সঠিক ভাবে চেনা যাচ্ছে না ।

রমা ও বিজয়ের বন্ধুত্ব যেন ধীরে ধীরে অন্য এক সম্পর্কের মোড় নেয়, কিন্তু পাছে তাদের বন্ধুত্ব কোনো আঘাত না লাগে সে জন্য রমা বিজয়কে কিছুই বলতে চাইছে না। রমা মনে মনে ভাবে যে, হয়তো শুধুমাত্র বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যাবে বলে কত ভালোবাসা আজ অপ্রকাশিত। বিজয়ের মনে রং-এর ছাপ দেখা দিলেও বিজয় এ জগতে সদ্য পদার্পণ করেছে। তাই হয়তো এই জগৎ-টা বিজয়ের অনেকটা আজানা। বিজয়ের রমাকে নিয়ে একটাই চাওয়া যে সে যেন এভাবেই রমার চোখের দিকে তাকিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু সময়ের স্রোত আর কারও বাধা মানে না। আর কারও কথাও শোনে না। তাই হয়তো বয়ে চলে নিরন্তর গতিতে, নির্দিষ্ট দিকে।

0

হঠাৎই একদিন রমা সেখানে আসেনি, বিজয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেকে এটা বলে সান্তনা দেয় যে, হয়তো রমার শরীরটা খারাপ। পরেরদিন স্বাভাবিক ভাবেই বিজয় খুবই চঞ্চল, রমা তো আজ কলেজ আসেনি? এখানে আসবে তো? ভাবতে ভাবতে দেখল রমার এক বান্ধবী কি যেন একটা হাতে করে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলে, 'রমা আর আসবে না'। তৎক্ষনাৎ বিজয় চিঠিটা বুলে দেবে তাতে লেখা আছে যে -

এটাই হয়তো আমাদের শেষ আলাপ। কিছু কিছু সম্পর্ক তো ক্যালেন্ডারের পাতার মতো পরিবর্তনশীল হয়! প্রতি মাসেই তো অনিবার্যভাবে ক্যালেন্ডারের পাতায় বদল ঘটে, ঠিক তেমনই সময়ের ঝরা পাতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যায় সম্পর্ক। বিবর্ণ হয়ে যায় সম্পর্কের নাম, বদলে যায় পরিচয়। ক্ষীণ হয়ে আসে যোগাযোগ। স্মৃতির আস্তাকুঁড়গুলো নির্বাসিত হয় একমুখী ভালোবাসায়। নতুন আসে উত্তাল বাতাসে ঝরা বকুলের মতো, পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়ে অতীত। প্রাপ্তির খাতায় পড়ে থাকে শুধুই অতীত, পড়ে থাকে শুধুই স্মৃতি। বদলে যায় তো আমাদের জীবনের অনিবার্য ভবিতব্য। আজকে বিলাসিতাই হয়তো আগামীর 'পরিহাস'।

ভালো থেকো।

ইতি তোমার প্রিয় রুমা

চিঠিটা পড়ার পরেই, যেমনি করে গোধূলির মেঘ দিনের আলোকে গ্রাস করেঠিক তেমনই হয় বিজয়ের যেন তার দৃষ্টি শক্তিকে গ্রাস করেছে। বিজয়ের বুকের ব্যাথাটা
বেড়ে ওঠে। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় ক্ষীণ কঠে রমা! রমা!
এভাবেই প্রতিটি ভালোবাসায় সকাল আসে, তারপর দুপুর, বিকেল অবশেষে সন্ধ্যা। আর
এসব কাহিনিগুলো দূর আকাশে মেঘে ঢাকা কোনো এক অলস কবির কলমে আটকে পড়ে,
আর তা হয়ে ওঠে এক একটি সেলুলয়েড। এভাবেই হয়তো বিজয়ের জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে
আসে, আর ঝরা পাতাগুলো না-হয় তাদের নিষ্পাপ সম্পর্কের সাক্ষী হয়ে থাকল।

#### মা

#### চন্দন মাজী

দ্বিতীয় সেমেস্টার কলা বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মাকে কেউ দিয়ো না কষ্ট সবাই বাসবে ভালো। মায়ের জন্য দেখলাম আমরা এই জগতের আলো। প্রথম যখন হাঁটতে শিখি মায়ের আঙ্গুল ধরি। মায়ের হাতটা ধরেই কিন্তু জীবনটাকে গড়। ছোট বেলায় ঘুমের ঘোরে মায়ের আঁচল চেপে ধরি। ঘুম পাড়ানি কতো গানে মা আনত ডেকে ঘুমের পরি। মা'কে তোমরা বাসবে ভালো কেউ কোরো না অবহেলা। মা ছাডা জীবন হবে মরুভূমিতে পথ চলা। সন্তানকে মা খাওয়ায় বেশি নিজেই খায় কম। সেই সন্তানরাই আজ স্থান দিয়েছে মা-কে বৃদ্ধাশ্রম। মাকে আমরা দেব না যেতে দেব মেহের বন্ধন। মায়ের কম্টের কথা লিখেছে লিখেছে আজ চন্দন।

#### দিনকাল

পাপিয়া মন্ডল

চতুর্থ সেমেস্টার ইংরেজি বিভাগ (স্নাতকোত্তর) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

কেমন সব দিনকাল এল, ফিরে কি আর পাবো আগের দিনগুলো ? মানুষের এত অত্যাচারে, প্রকৃতি হয়েছে ক্ষুব্ধ। করোনা পাঠিয়ে তাই, মানুষকে করেছে জব। তার উপর আবার বৃষ্টি, এ যেন এক নতুন দিনের সৃষ্টি। হায় রে দিনকাল, মানুষ অসহায়, রোজগার নেই, ঘরে বসে, পড়েছে হাহাকার। সবাই আজ ঘরবন্দি, বেরোতে পারছে না। চরম এক পরিস্থিতি কিছু করাও যাবে না। কত মানুষ কৰ্মহীন, কত মানুষ বসে, মাঠে যে চাষ করবে, সব গেছে জলে ভেসে। কবে হবে আবার ঠিক কেউ জানেনা। কতজনকে হারালাম **कित्र वात भाता गा।** প্রকৃতি এত ক্ষুব্ধ, নিচ্ছে প্রতিশোধ। তবুও মানুষ বোঝে না হারিয়েছে নিজের বোধ।

#### করোনার থাবা

সোমাশ্রী সামন্ত দ্বিতীয় সেমেস্টার দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

স্বার্থপরতায়, নৃশৃংসতায়, নানা জাতিতে বিভেদ দাঙ্গায়, সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠার লড়াইয়ে, বার বার রক্তাক্ত হয়েছে পৃথিবী। আজ হঠাৎ এক লহমায় সব কিছু কেমন থমকে গেল! <mark>স্বপ্নের শহর ইতালি আজ কবর স্থানে রূপান্তরিত ।</mark> কারণটা, না না, কোনো বিশ্বযুদ্ধ নয়, মহামারী! ভাইরাস! হ্যাঁ! হ্যাঁ! ভাইরাস অতি ক্ষুদ্র এক ভাইরাস মানুষের এত বড়াই, অহংকারকে এক নিমেষে চুরমার করে শিক্ষা দিয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের কোনো জাত পাত হয় না। গর্জে গর্জে সে প্রতিনিয়ত বলে চলেছে, ওরে অতি শিক্ষিতের দল! ভাইরাস জাত মানে না। মানে না সে মন্দির, মসজিদ, ভেদাভেদ, কবি সুকান্তের "দেশলাই কাঠি"র মতো ক্ষুদ্র ভাইরাস সারা পৃথিবীর বুকে তার বিধ্বংসী নৃত্য করে চলেছে। রাহু , কেতুর মতই গ্রাস করে ফেলেছে সে মানুষের শরীর। ভারতের বাতাসেও আজ বিপদের কালো মেঘ, আজ সারা পৃথিবীর বুক চিরে একটাই আর্তনাদ-"Dear God! Please save our lives!" জানা নেই, কারোর জানা নেই, পৃথিবী কবে পরিত্রাণ পাবে, সর্বনাশী এই ভাইরাসের মরণ কবল থেকে...?

#### যানবাহন

শংকর চক্রবর্তী
চতুর্থ সেমিস্টার
সংস্কৃত বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

কি দাদা খুব তাড়া, গাড়ি চালাচ্ছেন হেলমেট ছাড়া। यिष वा दिलाम निलन, গাড়িতেই তা ঝুলিয়ে দিলেন। ড্রাইভ করছেন মোবাইল কানে, बूँकि আছে निজের প্রাণে। টার্নিং নেবেন সিগন্যাল শহীদ. নইলে হবে হিতে বিপরীত। রেড সিগন্যালে দাঁড়িয়ে যান, নিজের জীবনের মেয়াদ বাড়ান। গাড়ির স্পিড ধীরে করুন, এক্সেলেটর নয়, ব্রেক ধরুন। টার্নিং-এতে সিটি মারুন, না মেরে সিটি মরছে তরুণ। गािं जानाता थूर जाला, किन्छ मानतिन नियम छला। তোমার জীবনের বহুমূল্য দাম, নিজের ভুলেই যাচ্ছে জান। তাইতো বলি রিক্স নিয়ে নয়, এতে আপনার জীবনের ভয়।

#### প্রিয় বান্ধবী

#### রাহুল দেব বর্মন

চতুর্থ সেমেস্টার, কলা বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

এ কেমন বিচিত্র পৃথিবী! যাকে তুমি আপন ভেবে কাছে টেনে নিচ্ছ, <mark>পরিস্থিতি তাকে তোমার থেকে দূরে সরি</mark>য়ে দিচ্ছে। দেখেছিলাম প্রথম তোমায় স্কুলে, <u>সেইখানেই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের বিকাশ ঘটে।</u> খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমরা, সবকিছু পরামর্শ নিতাম একে অপরের কাছে, <mark>আর কিছুই ছিল না দুজনের বন্ধত্বের ফাঁকে।</mark> সবাই ভাবতো ছিল অন্য কিছু দুজনের মাঝে!! আমি জানতাম তোমার ওই কোমল হৃদয়, মনের ওই দীপান্তরে রঙীন শোভায় শোভিত হচ্ছে মাঝে মাঝে ওই সব কথা শুনে। কিন্তু তুমি ওটা আমাকে বা কাউকে বুঝতে দাওনি. আমি আজও জানি না তোমার মনের মধ্যে সত্যি আমি কি ছিলাম, তোমার সঙ্গে আগে রোজ কথা হতো ফোনে, পরিস্থিতি এখন বাধ্য করেছে কথা কমিয়ে দিতে। ভাবিনি এমন কোনদিন আসবে তোমার আমার সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধত্বের মাঝখানে। আর কিছু দিন পরে তুমি অপরের বাড়ির বধু হবে, তখন হয়তো ভুলেই যাবে আমাকে, কিন্তু আমি মনে রাখবো তোমায় ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে। কষ্ট হবে প্রথম তোমার পুরনো কথা ভেবে, जानि ना क्यान जात काणिता क्षेथ्य उरे मिन छला. কিন্তু তোমার ওই ব্যবহারগুলো আমার সারা জীবন মনে রবে।

## হারানো জিয়া

সুমন্ত মিশ্র দ্বিতীয় সেমেস্টার দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

জিয়া কোথায় হারিয়ে গেল! বন্ধ মনের দরজা খোলো। রাগ করে না আমার ওপর, তুমি আমার বুকের ভিতর। এস আমার একটু কাছে. মনটা তবে পরানে বাঁচে। তন্র থেকে হৃদয় কেডে. যাচ্ছ কেন অমায় ছেড়ে! মনের মাঝে ডাকছে প্রিয়া, কোথায় বসে জিয়ার হিয়া? মন যে কাঁদে তোমার তরে। জিয়া খুঁজে সে কেঁদে মরে! তৃষ্ণা মেটাও সাড়া দিয়ে, याउ ना जूमि वामाय नित्य। তোমার সঙ্গে দেব সঙ্গ, করছি আমি মানভঙ্গ। श्रांतिस्य स्थल ना किस्त अञ्, কাছে এসে ভালোবাসো।

## প্রথম কলেজ লাইফ

সুমন্ত মিশ্র দ্বিতীয় সেমেস্টার দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

স্কুল পেরিয়ে জীবন নতুন, নতুন পথের দিশা আধো কাঁপা বুকের নতুন গড়ার নেশা কম্পাসেতে নতুন বন্ধু, চেনা কিছু মস্তি; টাচ স্ক্রিনেতে খুঁজে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া দোস্তি নতুন ধারার অধ্যাপনা, নতুন পড়ার স্টাইল, অ্যাসেম্মেন্ট দিতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে স্মাইল কত দফার প্রেম হয়, দেখি যে কত ব্রেক আপ কত নতুন সাজের বাহার, কত গভীর মেক আপ ।
অজানাকে জানার তরে কলেজ পথে পাড়ি, এর মধ্যে চলছে ধীরে আমার শিক্ষার গাড়ি

## সুপার সাইক্লোন 'আমপান'

সাহেব দিভা

দ্বিতীয় সেমেস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (স্নাতক, সান্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

দুরন্ত আক্রমণে ভেঙে চুরমার-ভেঙে যায় গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি টিনের চাল, শাখা-ডাল-পাতা গাছের, আকাশে, তীব্ৰ আক্ৰমণে! আমপান! তোমার সভ্যতার বাতিস্তম্ভ পড়েছে উপড়ে ভেঙে। গহীন আঁধারে বঙ্গদেশ, খাদ্য পানীয়হীন, নীড়হারা আনাহার ক্লিষ্ট মানুষ! গেছে উড়ে ক্ষুদ্র কুঁড়ে। উৎপাটিত বৃক্ষ ধরাশায়ী, চাপা পড়েছে কুঁড়ে সহ শিশু-বৃদ্ধ-নারী সারা পরিবার। ভেসেছে ফসল জমির, উত্তাল নোনা জলোচ্ছাস করেছে গ্রাস গ্রাম, দেশ, রুপোলি সম্পদ পুকুরের! হাহাকার আকাশে বাতাসে! তোমার সুতীব্র সাঁড়াশি ঘূর্ণি আক্রমণে সুপার স্লাইক্লোন তীক্ষ্ণ রুষ্ট ধ্বংস যজ্ঞ করল সমাপন! বঙ্গোপকূলে জৈষ্ঠ্যের প্রথম পর্বেই উদরস্ত করে গেল শতাধিক মানুষ! প্রকৃতি, থামাও রুদ্রতা তোমার, শান্তি আসুক নেমে ধরায়।

#### শরৎ

অনিমা সামন্ত

দ্বিতীয় সেমেস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (স্নাতক, সান্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

এসেছে শরৎ রমরমিয়ে, কাশ ফুলকে সখী করে। भिडेलि এल সুবাস निरः শুভ্র মেঘের কোলে, ছুটছে বায়ু, ছুটছে কাশ, শরৎ-এর ইশারায় শিউলি তার সুবাস নিয়ে, कরছে খেলা হদয় निয়ে। মন মাতানো আনন্দ নিয়ে আসছে পুজোর গন্ধ, শুত্র মেঘের উজ্জ্বল জোৎস্নাতে মন মাতবে আনন্দে। আসবে মা অস্ত্র হাতে ধরিনীর বুকেতে। আসবে সুদিন, ভাঙবে বিভেদ মা-এর আগমনে, আসবে শরৎ রমরমিয়ে काशयुनक मथी करत।

## যত নীল পাগল পাহাড়

## ড. পীযূষ কান্তি ভট্টাচাৰ্য

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

আশিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীজাত পাঠ করেছিলেন–

পোয়ের তলায় সর্ষেদানা, হাতে কলম খোলা, লেখারা তাঁর ভাবনা জলে ভাসানো গন্ডোলা, এই দেখি এই চৌকাঠে, তো ওই দেখি ওই দূরে, জৌলুসে তাঁর ধাক্কা লেগে সময় থুরথুরে...' (আদর)

সহাস্য, প্রাণোচ্ছল, সুদূরপিয়াসী, ডাকাবুকো, স্বতঃস্কৃত আবার তিনিই কখনও তির্যক, কখনও ক্রুদ্ধ, প্রয়োজনে কঠোর কিন্তু সমস্ত কিছুর পরেও 'ছোটো কথা, বড়ো কথা, ছোটো দুঃখ, বড়ো বেদনা/ সব ছাড়িয়ে/ মস্ত এক হাসির পাহাড়।' তাইতো তিনি মৃত্যুর ক্রেকদিন আগে (৯ অক্টোবর, ২০১৯) অবলীলায় বলতে পারেন 'না হয় ক্যান্সারই হয়েছে।... হঠাৎ অশীতিপর নবনীতার জন্যে এত শোক কীসের! তার তো যাবার সময় এমনিতেই হয়েছে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে কচি বাচ্চার মহাপ্রয়াণ হতে চলেছে।' নিজের অসুস্থতা ও মৃত্যু নিয়ে চূড়ান্ত রসিকতা করেছিলেন। বলেছিলেন– 'ক্যান্সার হলো মৃত্যুর একটি অজুহাত।' তাঁর কাছে 'জীবন নয় জীবনসংগ্রাম' কিন্তু ভয় তাঁর ছিলো, সে ভয় কবির ভয় 'বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতাকেও আমি ভয় করি না, আমার একটা ভয়, কবিতা যেন আমাকে শেষদিনেও পরিত্যাগ না করে।' না কবিতা তাঁকে কোনোদিন ত্যাগ করে নি। সুতো ছাড়া ঘুড়ির মতো শূন্যলোকে লাট খেয়ে ভেসে যায়নি তাঁর কবিতা। তাঁর লেখার ভাষা ছিলো সরল কিন্তু মননে বৃহৎ। 'তোমার কবিতা' 'তোমারই কবির সম্পদ'।

আপনিই বলতেন 'সব মানুষ বুড়ো হয় না। বুড়ো হওয়ার কোনো ফিক্সড এজ আসলে নেই।' আপনারও ছিল না। 'পাঁজির বয়স' আপনাকে 'বেড়া গলে' নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে।

'সময় ফুরায়।
তবুও অশোকফুল লাল হয়ে ফোটে।
কিন্তু কবিরা মরে না।'

## তবু অনন্ত জাগে

#### অদ্বিতীয়া চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

মৃত্যুর সমুদ্রে কয়েক লিটার রক্ত বুকে নিয়ে বেঁচে আছি। খাদের গায়ে ঝুলে থাকা মাটির চাঁই-এর মতো। ফ্রিজের বাইরে রাখা বরফের মতো। মৃত্যুকূপের বাইক আরোহীর মতো। কলে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো। কে জানে আর কতক্ষণ! হঠাৎ করেই হারিয়ে যায় চেনা মানুষের নিঃশ্বাসের গন্ধ। নিথর দেহে বাতাস ঢোকে না আর। এহেন স্তব্ধতার সঙ্গে শীতকাল বড্ড মানানসই। পাতা ঝরার মরশুম...

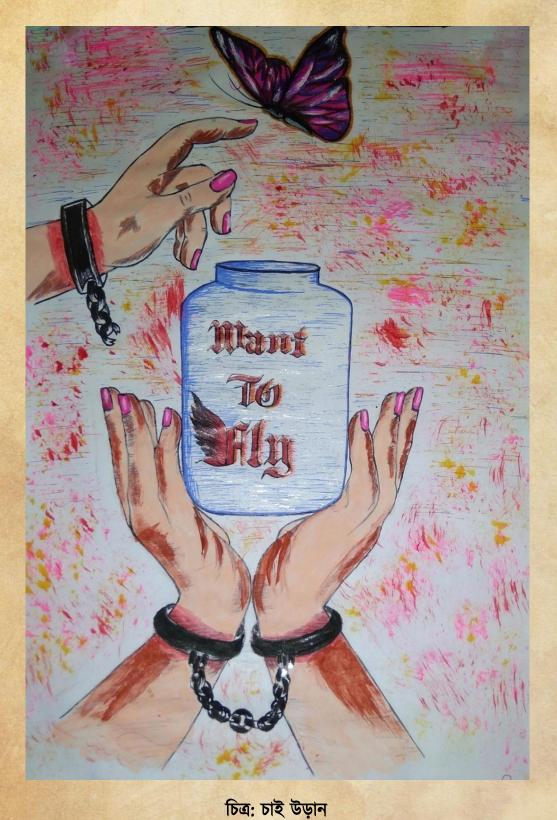
এক মাত্র শূল্যতাই শৃঙ্খলা দিতে জানে। তাই হয়তো অন্তিত্বের কাছে জবাবদিহি করে না মৃত্যু। লকডাউনের ভারতবর্ষে হঠাৎ লাল হওয়া ট্রাফিক সিগনাল সবুজ হতে চায় না। পথ থেমে যায় মাঝপথে। আশির দশকে রিভল্ভিং স্টেজে 'ওম্ শান্তি ওম্' গাওয়া সুপুরুষটি থেকে যান বহু নারীর হৃদয়ে। চলে যান ঋষি কাপুর। মনে আছে, ছেলেবেলায় ঘুমোনোর সময় মায়ের আঁচল ধরে রাখতাম মুঠোয়। মা ওঠার সময় মুঠো খুলে দিলেই মন খারাপ। তবে সব মায়েরা মুঠো খোলেন না বুঝি। মা সাঈদা বেগমের মৃত্যুর চার দিনের মধ্যেই চলে গেলেন অভিনেতা ইরফান খান। হয়তো মায়ের কাছেই । আচ্ছা, মৃত্যুতে পৌঁছলে জীবন মিসড় কল দেয়?

ঠিক যতটা সুর থাকলে গানে আর কথার প্রয়োজন পড়ে না, কৈশোরের তেমন কিছু সুর এসে হঠাৎ একদিন বলে যায়, ওয়াজিদ খান আর নেই। ঠিক কতোটা কষ্ট পেলে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি আপন মনে হয়? সুশান্ত সিং রাজপুত জানেন নিশ্চয়ই! তারকাদের বুঝি ভক্ত থাকে শুধু, বন্ধু থাকে না। ভগবানেরও কি একলা লাগে তবে?

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ওয়েব পেজ এক-একবার রিফ্রেশ করলেই মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে। মনে হয়, মৃত্যু কতো সহজ! শৈশবের হাসির মতো। কৈশোরের ভুলের মতো। যৌবনের প্রেমের মতো। তবু সব কিছুরই শেষ থাকে। জ্বর সেরে ওঠা স্নানের মতো। রেসিং ট্র্যাকে ফিনিশ লাইনের লাল ফিতের মতো। সমুদ্রের তীরে বন্দরের মতো। জীবনের শেষে মৃত্যু থাকে, আর মহামারীর শেষে জীবন...



চিত্র: বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর
চিত্রাঙ্কণ: দুর্গা বেরা
দ্বিতীয় সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়



চিত্রাস্কর্ণ: শম্পা সিং
চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়



'মুক্তো'-চিন্তা



ভেসে যায় আদরের নৌকো

লেন্সে: সায়ন্তন দিন্দা চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়



প্রজাপতি, কোথায় পেলি ভাই এমন রঙীন পাখা



ওয়াহ্ তাজ

**লেন্সে: সায়ন্তন দিন্দা** চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা <mark>থানা মহাবিদ্যালয়</mark>



ঘরে ফেরার গান



বিউটি-ফুল

**লেন্সে: সায়ন্তন দিন্দা** চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়



অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো



কালার-ফুল

লেন্সে: সায়ন্তন দিন্দা চতুর্থ সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়



সবুজ



মাছের সাজ

**লেন্সে: সৌমদীপ মান্না** দ্বিতীয় সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়



ক্ষুদ্ৰ আমি, তুচ্ছ নই



বুনন

**লেন্সে: সৌমদীপ মান্না** দ্বিতীয় সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা <mark>থানা ম</mark>হাবিদ্যালয়



कान रम त्मनत्व छाना



পরাগ পেলে

লেনে: সঞ্জয় প্রামানিক প্রাক্তনী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়



দিন ফুরোলে



মেলেছো ডানা

লেনে: সঞ্জয় প্রামানিক প্রাক্তনী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক) পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়

## ফেরা, ২০১৯-২০২০



৫৫০ম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন এবং আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট প্রতিযোগিতা, ২০১৯

# বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ:

কলা বিভাগ, সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক: ঝর্না মাইতি, শিক্ষা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক), প্রাপ্ত নম্বর: ৫৭২ (৭১.৫০%)

বিজ্ঞান বিভাগ, সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক: নন্দিতা দাস, জীববিজ্ঞান বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ), প্রাপ্ত নম্বর: ৯৮৯ (৭৩.২৫%)

বাণিজ্য বিভাগ, সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক: অলোক মহাপাত্র, বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক), প্রাপ্ত নম্বর: ৫৩১ (৬৬.৩৭%)

ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক: নন্দিতা দাস, জীববিজ্ঞান বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ), প্রাপ্ত নম্বর: ৯৮৯ (৭৩.২৫%)

ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক: অলোক মহাপাত্র, বাণিজ্য বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক), প্রাপ্ত নম্বর: ৫৩১ (৬৬.৩৭%)

পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ের ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৯শে আগস্ট, ২০১৯ এ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট প্রতিযোগিতা।

#### আর্ট প্রতিযোগিতা

প্রথম : শম্পা সিং - তৃতীয় সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)

দ্বিতীয়: সায়ন্তন দিন্দা- তৃতীয় সেমেস্টার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)

তৃতীয় : অঙ্কিতা মাইতি- প্রথম সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ স্নাতক, সাম্মানিক)

#### ক্রাফ্ট প্রতিযোগিতা

প্রথম: গনেশ চন্দ্র পাল - তৃতীয় সেমেস্টার, কলা বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ)

দ্বিতীয়: কল্যান দাস - প্রথম সেমেস্টার, কলা বিভাগ (স্নাতক, সাধারণ)

তৃতীয়: সৌরভ দাস- প্রথম সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)













ন্যাশনাল অ্যাসেম্মেন্ট এন্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অর্থানুকুল্যে আই.কিউ.এ.সি দ্বারা আয়োজিত জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্র (৬ই ডিসেম্বর, ২০১৯)



https://thebengalpost.in/news/present452.html



THEBENGALPOST.IN 'ন্যাক' এর উদ্যোগে, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল একদিনের জা... বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত হল 'NAAC' Sponsored One Day National সেমিনার।

06 Dec 2019 13:47 RK NEWS Digital Media



পিংলা থেকে সব্যসাচী গুছাইত:- বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত হল 'NAAC' Sponsored One Day National সেমিনার। সেমিনারকে সফল করার জন্য কলেজের সর্বস্তরের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র ছাত্রীদের কর্ম তৎপরতা ছিলো যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রঞ্জন চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ



Professor Ranjan Chakrabarti Vice-Chancellor Vidyangar University Midnapore - 721 102



VIDYASAGAR UNIVERSITY

Date: 24.12.2019

Dr. Chandra,

Upon your invitation, I visited Pingla Thana Mahavidyalaya on December 6, 2019 to inaugurate the NAAC sponsored Seminar organized by the IQAC of the College. Though this is my first acquaintance with you, I am well aware of the developmental activities that are going on in the College. I went there with a high level of expectation and I am happy to pronounce that I have not been disheartened to experience the real fact of the situation which is much alike to my notion. I am really impressed by your administrative capabilities and your praiseworthy endeavour to transform the College into a recognizable centre for dissemination of higher learning. I really appreciate and thank you for organizing such a wonderfully coordinated programme.

Best regards,

Sincerely,

(Professor Ranjan Chakrabarti)

Dr. Sukumar Chandra, Principal, Pingla Thana Mahavidyalaya, P.O. – Maligram, Paschim Medinipur – 721 140

> Website ; www.viilyasagur.ac.in E-mail ; vevu.confidential@gmail.com Telefax (@3222) 275329

ন্যাশনাল অ্যাসেস্মেন্ট এন্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অর্থানুকুল্যে আই.কিউ.এ.সি দ্বারা আয়োজিত জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্রের কিছু স্বীকৃতি

















জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন এবং ফুটবল প্রতিযোগিতা, ২০১৯















বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ২০১৯





স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, ২০১৯





আই,কিউ,এ,সি, এর উদ্যোগে আয়োজিত পেরেন্ট-টিচার মিট, ২০১৯



দোলযাত্রা

\*করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হয়ে একদিনের বেতন তুলে দিলেন, পিংলা খানা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ:\*

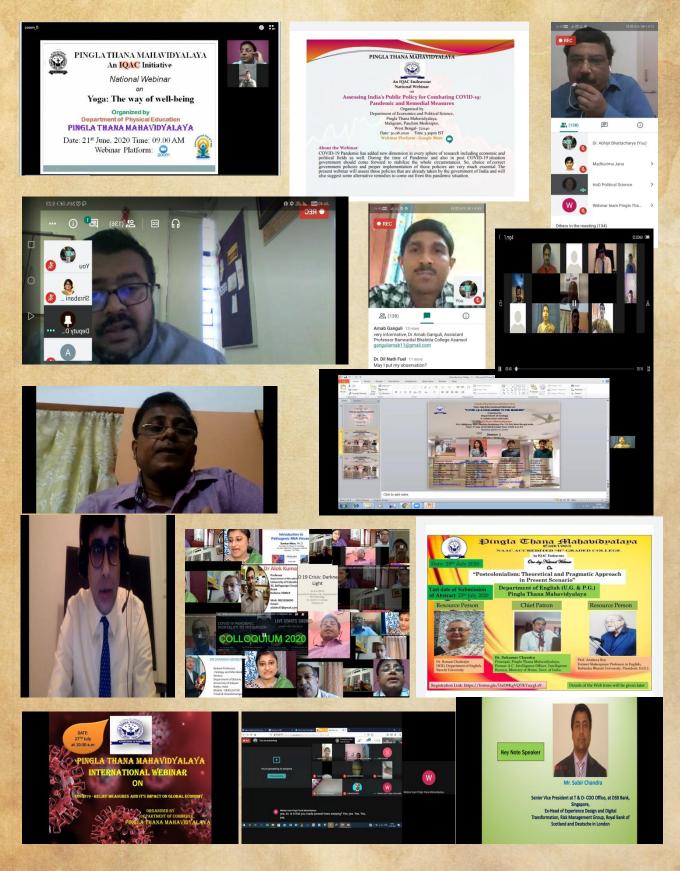
https://www.facebook.com/112396453652877/posts/167385514820 637/?sfnsn=wiwspwa&extid=9VJdIIIuEvxx4oVi



THEBENGALPOST.IN

করোলা মোকাবিলায় সিংলা কলেজের সমস্ত স্টাফ একদিনের বেতল তলে দিল কেন্দ্র ও রাজ্যের ত্রাণ তহবি

কলেজের তরফে সামান্য অবদান



২১শে জুন, ২০২০: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে শারীরশিক্ষা বিভাগ দ্বারা আয়োজিত জাতীয় স্তরের ওয়েবিনার ৩০শে জুন, ২০২০: অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ওয়েবিনার ১লা জুলাই, ২০২০: জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরের ওয়েবিনার ১৯শে ও ২০শে জুলাই, ২০২০: উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ দ্বারা আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরের ওয়েবিনার ২৭শে জুলাই, ২০২০: বাণিজ্য বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরের ওয়েবিনার ২৯শে জুলাই, ২০২০: ইংরেজি বিভাগ দ্বারা আয়োজিত জাতীয় স্তরের ওয়েবিনার

## शिश्ला थाना মহाविদ्যालय

e-পত্ৰিকা

eष्ट्रिया

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা আগস্ট, ২০২০

এই e-পত্রিকার সকল লেখা কপিরাইট সুরক্ষিত।এই e-পত্রিকার সকল লেখার মৌলিকত্বের দায় লেখকের। প্রকাশক বা সম্পাদক কোনো প্ল্যাগিয়ারিজমের জন্য দায়ী থাকবে না।